দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

পাহাড় হাসছে এই কৃতিত্ব দাবি করেছিলেন, এখন পাহাড় জ্বলছে এই ব্যর্থতাও মুখ্যমন্ত্রীরই — পৃঃ ১২

কেন মানা হচ্ছে না লিংডো কমিশনের সুপারিশ ? ‘সেন্ট জেভিয়ার্স মডেল’র মাধ্যমে ক্ষমতা কায়েম করাই শাসক দলের লক্ষ্য — পৃঃ ১৬

৬৯ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা।। ১০ জুলাই ২০১৭।। ২৫ আষাঢ় - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

রামনাথ কোবিন্দ

মীরা কুমার

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন - ২০১৭

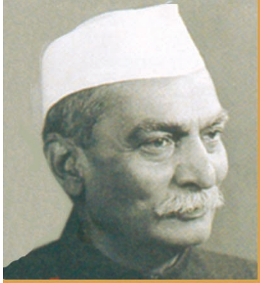

ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ
১৯৫০-১৯৬২

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন
১৯৬২-১৯৬৭

জাকির হুসেন
১৯৬৭-১৯৬৯

ভি ভি গিরি
১৯৬৯ - ১৯৭৪

ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ
১৯৭৪ - ১৯৭৭

নীলম সঞ্জিব রেড্ডী
১৯৭৭ - ১৯৮২

জ্ঞানী জৈল সিং
১৯৮২-১৯৮৭

আর বেঙ্কটরমণ
১৯৮৭ - ১৯৯২

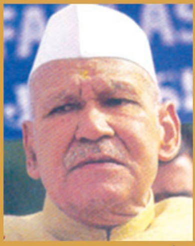

শঙ্কর দয়াল শর্মা
১৯৯২ - ১৯৯৭

কে আর নারায়ণন
১৯৯৭ - ২০০২

এ পি জে আবদুল কালাম
২০০২ - ২০০৭

প্রতিভা পাটিল
২০০৭ - ২০১২

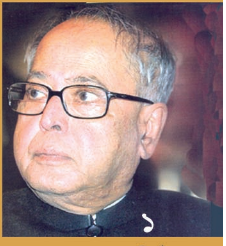

প্রণব মুখার্জি
২০১২-২০১৭

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ২৫ আষাঢ়, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১০ জুলাই - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

‘এক দেশ, এক কর’ বিশ্বের দরবারে ভারতের অর্থনীতিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : জিএসটি মানে সব্বোনাশ, মোদীর শুধু পৌষমাস □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

পাহাড় হাসছে, এই কৃতিত্ব দাবি করেছিলেন, এখন পাহাড় জ্বলছে এই ব্যর্থতাও মুখ্যমন্ত্রীরই □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১২

ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন □ অমলেশ মিশ্র □ ১৪

কেন মানা হচ্ছে না লিংডো কমিশনের সুপারিশ? সেন্ট জেভিয়ার্স মডেলের মাধ্যমে ক্ষমতা কায়েম করাই শাসক দলের লক্ষ্য □ অভিমন্যু গুহ □ ১৬

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে আনুগত্যের রাজনীতি □ চন্দ্রভানু ঘোষাল □ ১৯

ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবন : ফিরে দেখা □ ড. তুষারকান্তি ঘোষ □ ২২

আমলাতন্ত্রকে ভারতের পরিবর্তনের বাহক হতে হবে □ এল সি গোয়েল □ ২৭

ভারতে গুরু পরম্পরা □ সুকান্ত মজুমদার □ ৩১

‘অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান’ □ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০** □ **অঙ্গনা : ৩৪** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৭** □ **অন্যরকম : ৩৮** □ **খেলা : ৩৯** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

এবার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চারবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে দেওয়া-নেওয়ার কূটনীতিতে কার কতটা কী লাভ হলো, আগামী সংখ্যার আলোচ্য সেটাই। লিখেছেন প্রণয় রায়। সেই সঙ্গে থাকছে ‘এক দেশ এক কর’ নিয়ে আলোচনা। সম্প্রতি সংসদে গৃহীত পণ্য পরিষেবা কর নিয়ে লিখেছেন দেবব্রত চৌধুরী ও কুণাল চট্টোপাধ্যায়।

।। দাম একই থাকছে— ১০.০০ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE®

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জিএসটি : বিরোধিতা বোকামি

কোনও বিষয়ে জলঘোলা কিংবা হৈ হল্লা করিয়া বাজার গরম করিবার ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। কোনও অন্যায় বা অনৈতিক কাজের বিরূদ্ধে বাংলা হইতে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইতেছে তাহা বুঝা যায়। কিন্তু কোনও ভালো কাজ বা এমন কোনও কাজ যাহার বিরোধিতা করিয়া প্রতিরোধ করা যাইবে না, পশ্চিমবঙ্গে তাহারও বিরোধিতা করা হইতেছে, ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের। এখন পণ্য ও পরিষেবা কর(জিএসটি)-এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষোভ প্রদর্শন হইতেছে। রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল তৃণমুল কংগ্রেস, প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস এবং বামপন্থী দলগুলি একই সঙ্গে এই করের বিরোধিতায় শামিল হইয়াছে। বামপন্থী দলগুলির বিরোধিতা তবু বোঝা যায়, কেননা ইহাদের ইতিহাস বরাবরই দেশদ্রোহিতার, বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। এই করের বিরুদ্ধে এই রাজ্যে সর্বাপেক্ষা সোচ্চার তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সংসদে জিএসটি বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে তাঁহার দল তৃণমূল মোদী সরকারকে সমর্থন করিয়াছে। এমনকী জিএসটি চালু করিবার জন্য তাঁহার নেতৃত্বাধীন সরকার পশ্চিমবঙ্গে অধ্যাদেশও জারি করিয়াছে। বিস্ময়ের হইলেও সত্য, তবু মমতা এবং তাঁহার দল ইহার বিরোধিতা করিতেছেন। রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ইহার বিরোধিতায় রাস্তায় নামিবেন বলিয়া হুমকি দিয়াছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য ইহার বিরোধিতা করিয়া কলকাতায় পথ অবরোধ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির কুশপুত্তলিকা দাহ করা হইয়াছে। সিপিএমের রাজ্যসম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র জিএসটি হইতে করপোরেট সেক্টর অর্থাৎ পুজিবাদীরাই ফয়দা লুটিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রায় সতেরো বছর ধরিয়া বিভিন্ন স্তরে বিচার-বিতর্কের পর কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সর্বসম্মতিক্রমে গত ৩০ জুন মধ্যরাত্রে সংসদের এক ঐতিহাসিক অধিবেশনে জিএসটি বিলটি আইনে পরিণত হইয়াছে। এখন এই বিলের বিরোধিতাকে আহাম্মকি ছাড়া আর কী বলা যাইবে! কিছু বিষয় রহিয়াছে যাহা সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই চালু হইয়া যায়। দেশে এই প্রথম সব থেকে বড় রকমের কর ব্যবস্থার সংস্কার করা হইল যাহার শ্রেয় অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রাপ্য। নব্বইয়ের দশকে আর্থিক উদারীকরণ নীতি চালু হইয়াছিল। তাহার পর এই লক্ষ্যের দিকেই দেশ ক্রমশ অগ্রসর হইতেছিল। জিএসটি এই অর্থনৈতিক অগ্রসরতার অভিমুখে একটি পদক্ষেপ। দেশে কমপিউটার চালু করিবার সময়ও পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সৌজন্যে বামপন্থীদলগুলি, বিশেষত সিপিএম। কিন্তু তাহাদের সর্বপ্রকার বিরোধিতাকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া কমপিউটারের যুগ শুরু হইয়াছে, এখন আমাদের দেশ ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করিয়াছে। যে ভাবে আজ লোকে কমপিউটারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেছে,আগামীদিনে এইভাবে জিএসটি লাভের বিষয়টিও বুঝিতে পারিবে। তাই জিএসটি-র বিরোধিতা না করিয়া এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করিতেই রাজনৈতিক দলগুলির অগ্রণী হওয়া উচিত।

সুভাষিতম্

পুত্রাস্তে বিবিধৈঃ শাস্ত্রৈর্নিযোজ্যাঃ সততং বুধৈঃ।
নীতিজ্ঞা বুদ্ধিসম্পন্না ভবন্তি খলু পূজিতাঃ।। (চাণক্য নীতি)

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পুত্রদের নানা শাস্ত্রে নিযুক্ত করবেন। তাহলেই তাঁদের পুত্রগণ নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও সকলের পূজ্য হতে পারবে।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে এমন কী যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে। যার জন্য এই পুরস্কার? আর সত্যিই কি পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছে? পরিসংখ্যান কিন্তু তা বলছে না। জেলা শহরের বিদ্যালয়গুলিতে এই প্রকল্প সফল হলেও প্রত্যন্ত গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভিভাবকদের মধ্যে মোটেও কন্যাশ্রী প্রকল্প গৃহীত হয়নি। উলটে তাঁরা ১৩-১৪ বছর বয়সের মধ্যেই তাদের কন্যাদের বিয়ে দিয়ে মাথা থেকে দায়ভার মুক্ত করতে বেশি পছন্দ করছেন। ফলে মুসলমান ছাত্রীদের মধ্যে যেমন স্কুল ছুটের সংখ্যা বাড়ছে তেমনই অল্প বয়সে মা হয়ে রুগ্ন ও মৃত সন্তান প্রসব করছে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে গেলেই যে কেউ এই তথ্য জানতে পারবেন। মালদহ, মুর্শিদাবাদ,

দুই দিনাজপুর-সহ মুসলমান জনবহুল মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে চালানো বেসরকারি সমীক্ষায় জানা গেছে, যেসব বিদ্যালয়ে মুসলমানছাত্রীর সংখ্যা বেশি সেখানে ৪০ শতাংশ ছাত্রীর মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়েই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। মাদ্রাসার অবস্থা আরও করুণ, প্রায় শতকরা অর্ধেক ছাত্রীদের সেখান বাল্যবিবাহ হয়ে চলছে। উদাহরণস্বরূপ, মালদহ শহর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরত্বে যদুপুর ও কমলাবাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় দুটির ৪০ শতাংশ মুসলমান ছাত্রীর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। শহরের এত কাছে থেকেও এবং প্রশাসনের নজরদারি ও কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও যদি এই ভাবে বাল্যবিবাহ হয়, তবে প্রত্যন্ত গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে কী ঘটে চলছে, সহজেই অনুমেয়। এর পরেও যদি কন্যাশ্রী প্রকল্পকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দেওয়া হয় তাহলে বুঝতে হবে, যে সংস্থা এই প্রকল্পকে পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করেছে, তাকে রাজ্য সরকার উৎকোচ দিয়েছে। আর একটি বিষয়ে কন্যাশ্রী পুরস্কার পাওয়ার অযোগ্য, তা হলো রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে দৈনিক খবরের কাগজগুলিতে দেখা যায়, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সদ্যোজাত শিশু কোলে পরীক্ষা দিচ্ছে আর সরকার তাকে উৎসাহিত করছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বয়স ১৫-১৬ বছরের মধ্যে অথচ সরকার কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ করতে চাইছে।

সুতরাং এক সম্প্রদায়ের দরিদ্র কন্যাদের বাল্যবিবাহের অন্ধকারে রেখে কেবলমাত্র শহরের শিক্ষিত বড়লোক বাড়ির কন্যাদের কিছু টাকা পাইয়ে দিয়ে কন্যাশ্রী প্রকল্পকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

পাঠ্য বইয়ে মগজধোলাইয়ের রসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আজকাল স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত না করে সক্রিয় রাজনীতিতে নামার ইন্ধন জোগায়। ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা পর্ষদের নবনিযুক্ত কর্ণধার ব্রজবিহারী কুমার এই অভিযোগ করে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্রছাত্রীদের 'মগজধোলাইয়ের কেন্দ্র' বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রজবিহারী কুমার গত মাসে দেশের সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় আরও গতি আনার জন্য পর্ষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, জাতপাত-ভিত্তিক দ্বন্দ্ব বা অসহিষ্ণুতা নেহাতই বিক্ষিপ্ত ঘটনা। একে এদেশের সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন হিসেবে দেখলে ভুল হবে। তিনি বলেন, 'পাঠ্যবইয়ের প্রয়োজন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য। তাদের মগজধোলাই করে ক্যাডার বানানোর জন্য নয়। আমি সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে ছাপা ভারতের একটি মানচিত্র দেখেছি। সেই মানচিত্রে জম্মু-কাশ্মীর নেই। আবার অন্য একটি মানচিত্রে সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চল অনুপস্থিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখনকার পাঠ্যপুস্তকগুলি নির্দিষ্ট কয়েকটি রাজনৈতিক কর্মসূচি তুলে ধরছে।' সারাদেশে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতার জন্য তিনি এই ধরনের পাঠ্যপুস্তককে দায়ী করেন।

জঙ্গি নেতা সাবির শাহ্‌কে ইডির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি দিল্লির এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সাবির শাহ্‌কে গ্রেপ্তার করার জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে। প্রসঙ্গত, এ পর্যন্ত গত দু' বছরে আটবার তাঁকে হাজিরা দেওয়ার সমন ধরালেও শাহ্ আইনের পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দপ্তরে হাজির হননি। সেই সূত্রেই এ সপ্তাহে শাহ্‌কে গ্রেপ্তার করা হবে বলে খবর। পাকিস্তান থেকে হাওয়ালার মাধ্যমে বিপুল টাকা আদান প্রদানের অভিযোগেই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইডি'র তদন্ত অনুযায়ী শাহ্ দিল্লির সন্নিকটস্থ অঞ্চল ও দেশের বহু জায়গায় মূল্যবান নানান সম্মত্তি ক্রয় করেছেন, যে টাকার উৎসের কোনো হিসেব নেই। এই টাকার উৎস সম্পর্কে প্রমাণ দেওয়ার জন্যই তাঁকে তদন্ত প্রক্রিয়ায় বার বার যোগ দিতে ডাকা হয়।

প্রসঙ্গত ২০০৫ সালে দিল্লি পুলিশের একটি স্পেশাল সেলের হাতে এক হাওয়ালা কারবারি ধরা পড়ার পর তার কাছ থেকে ৬৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। ওই হাওয়ালা কারবারির বয়ান অনুযায়ী ওই টাকা শ্রীনগরে সে গিলানির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। ইডি'র তদন্ত সূত্রে প্রকাশ শা নিয়মিত পাকিস্তান থেকে ভারতে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালানোর জন্য বেআইনি অর্থ পেয়ে থাকে। জম্মু ও কাশ্মীরের হাওয়ালা কারবারি মহম্মদ আসলাম ওয়ানি দিল্লি পুলিশের হাতে সম্প্রতি ৫ কেজি বিস্ফোরক, একটি পিস্তল, ১৫টি বোমা ও ৬৩ লক্ষ টাকা সমেত ধরা পড়ে। আসলাম ওয়ানি জেরায় স্বীকার করে যে পাকিস্তান থেকেআসা হাওয়ালার টাকা সংগ্রহ করে শাহ্‌কে দেওয়ার কাজে সে কয়েক বছর ধরে লিপ্ত।

মীরার বিবেকের ডাকে তাঁর সমর্থকেরাও কর্ণপাত করছেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস-বাম-তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থী মীরা কুমার বিবেক ভোটের আর্জি জানিয়েছেন। এছাড়া তাঁর কোনো উপায়ও ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতি এখন যেদিকে মোড় নিয়েছে তাতে তাঁর সমর্থনকারীদের সব ভোটও যে তাঁর ভাগ্যে জুটবে, সে আশাটুকুও আর করা যাচ্ছে না। সমাজবাদী পার্টির একদা সুপ্রিমো ও বর্তমানে লোকসভার সাংসদ প্রকাশ্যেই এনডিএ প্রার্থী রামনাথ কোবিন্দকে সরকারি ভাবে সমর্থনের ঘোষণা করেছেন। এবং তাঁর তুতোভাই শিবপাল যাদবও একই পথের পথিক হবেন, এটা আশা করাই যায়। তাই অখিলেশ এককভাবে যতই কংগ্রেসের পাশে থাকার চেষ্টা করুন না কেন, সমাজবাদী পার্টির একটা বড়ো ভোট রামনাথ পাচ্ছেনই। মায়াবতী মীরা কুমারের দিকে থাকার চেষ্টা করলেও তাঁর দলের অনেকেই এনডিএ শিবিরের দিকে ঝুঁকছেন। এক্ষেত্রেও অ্যাডভান্টেজ রামনাথ। এমনিতে ৪০৩ সদস্যের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় সমাজবাদী পার্টির ৫৪ ও বহুজন সমাজ পার্টির ১৯ জন বিধায়ক রয়েছেন। সমাজবাদী পার্টির লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদ সংখ্যাও যথাক্রমে ৫ ও ১৮। রাজ্যসভায় বহুজন সমাজ পার্টির ছয় সদস্য রয়েছেন।

জনঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে উত্তরপ্রদেশের বিধায়ক ও সাংসদদের ভোটমূল্য বেশ বেশিই। এমনিতেই বিজেপি ঝড়ে উত্তরপ্রদেশে বিরোধীরা প্রায় সাফ, কুড়িয়ে বাড়িয়ে যেটুকু রয়েছে, তাতেও রামনাথ কোবিন্দের ভাগ বসানো প্রায় নিশ্চিত। একই কথা প্রযোজ্য বিহারের ক্ষেত্রেও। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ তো বেসুরো গেয়েছেনই, তাঁর সহযোগী আরজেডি এবং কংগ্রেসের বিধায়কদের একাংশের ভোটও রামনাথ কোবিন্দ পেতে চলেছেন বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এনডিএ প্রার্থী ৬৫ শতাংশের বেশি ভোট পেতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই ভোটের হার যত বাড়বে বিরোধী শিবিরের ভাঙন তত স্পষ্ট হবে। মীরা কুমারের বিবেকের ডাক আপাতত তাঁকেই না দংশন করে বসে, রাজধানীর এই আশঙ্কায় ভুগছে দশ জনপথও। প্রসঙ্গত আগামী ১৭ জুলাই দেশে রাষ্ট্রপতি ভোট, গণনা ২০ তারিখ।

সংশোধনী

স্বস্তিকার ৩ জুলাই, ২০১৭ (৬৯ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা / শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা) সংখ্যায় মানস ঘোষ লিখিত 'পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদের মতো রাজনৈতিক নেতার খুবই প্রয়োজন' শীর্ষক রচনাটির সর্বশেষ অনুচ্ছেদটি ভুল ছাপা হয়েছে। অনুচ্ছেদটি হবে :

'বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদের মাপের নেতা নেই এবং এ রাজ্যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল বলে কিছু নেই। সুতরাং পাকপন্থী জামাতিরা যদি বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু বিতাড়নের প্রক্রিয়া শুরু করে তবে তারা আশ্রয় পাবে কোথায়? এই প্রশ্নটি ঘুরে ফিরে আমার মনকে আলোড়িত করে চলেছে।'

অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

— *সম্পাদক*

'মনের কথা' এবার লিখছেন নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দিনের মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হয় প্রায় সতেরো-আঠারো ঘণ্টা। আর এই শারীরিক ও মানসিক চাপ সামলানোর অভিজ্ঞতাই তাঁর বইতে লিখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বইয়ের প্রকাশক পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউজ। এই বছরের শেষে প্রকাশিতব্য এই বইটি বহু ভাষায় প্রকাশ পাবে বলে প্রকাশনা সূত্রের খবর। বইটি মূলত দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার কথা মাথায় রেখেই তৈরি হচ্ছে। বইতে মোদী নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাখ্যা করবেন পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের চাপ কমানোর কৌশল। রেডিওতে তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটেছিল। এতে তিনি অনুভব করেছিলেন একদল মেধাবী পড়ুয়া পরীক্ষার চাপ ঠিকমতো সামলাতে না পারার দরুন আশানুরূপ নম্বর পাচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রীর কাজের চাপ এমনিতেই প্রবল, তার ওপরে ভোট শতাংশের সঙ্গে আসন সংখ্যাকে যেভাবে তিনি সাফল্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন সেই অভিজ্ঞতার সূত্রেই নরেন্দ্র মোদী স্থির করেন এসব তিনি লিখে ফেলবেন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, যাতে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাগীদার হয়ে তারাও লাভবান হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, অভিজ্ঞতার অভাব ও কম বয়সের জন্য একদল ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা যায় যে, তারা যা শিখে এসেছে তা পরীক্ষার খাতায় সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। ফলে মেধা অনুযায়ী নম্বরও পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যদি কলম ধরেন তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা উজ্জীবিত হবে এবং তাঁর সাফল্যে তারা দিশাও পাবে। প্রকাশনা সংস্থার তরফে মোদীর মস্তিষ্কপ্রসূত এই বইটির ব্যাপারে খোদ মোদীরই বিবৃতি মিলেছে; 'আমি এই বিষয়টি এমনভাবে নির্বাচিত করেছি যা আমার হৃদয়ের খুব কাছে এবং আগামীদিনে যুবসমাজের নেতৃত্বাধীন সমাজের মৌলিক চিন্তাধারার মধ্যে এটি অন্যতম বলে পরিগণিত হবে, এই আমার বিশ্বাস।'

এই বইয়ের কারিগরি ও জ্ঞান সহযোগী হিসেবে কাজ করছে একটি অলাভজনক সংস্থা বলে জানা গেছে। নাম— ব্লুক্র্যাফট ডিজিটাল ফাউন্ডেশন।

হিজবুল প্রধান সালাউদ্দিনের হুমকি

ভারতকে আগেও মেরেছি পরেও মারব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আমেরিকা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করার পর এখনও এক সপ্তাহ কাটেনি, এরই মধ্যে হিজবুল মুজাহিদিন-প্রধান সৈয়দ সালাউদ্দিন একটি টিভি সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, তার সংগঠন এর আগেও ভারতে হামলা করেছে, পরেও করবে। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য ভারতের সেনাবাহিনী। তারা কোথায় যায়, কোথায় তাদের মোতায়েন করা হয়— আমরা সব নজর রাখি। সাধারণ মানুষকে আঘাত করা আমাদের রীতিবিরুদ্ধ।' আগামী দিনে ভারতীয় বাহিনীকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলার হুঁশিয়ারি দেন সালাউদ্দিন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে এই হিজবুল নেতা কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর কবর বানানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন। সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, 'আমরা ভারতের যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো সময় আঘাত হানতে পারি। সেই ক্ষমতা এবং নেটওয়ার্ক আমাদের আছে। কিন্তু আমরা তা চাই না। আমরা শুধু চাই দিল্লি আমাদের এতদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা দিক।' এদিকে সালাউদ্দিনের এই হুমকিতে ভারতের বহুদিনের দাবি মান্যতা পেল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য অশোক প্রসাদ বলেন, 'স্বরাষ্ট্রসচিব অনেক দিন ধরেই একথা বলছেন। সালাউদ্দিন নিজে স্বীকার করায় সারা পৃথিবীর কাছে ভারতের অভিযোগ স্বীকৃতি পেল!' সালাউদ্দিনকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করা একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত বলে তিনি জানান।

পুলওয়ামায় দুই হিজবুল জঙ্গির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জম্মু-কাশ্মীরের বাহ্‌মনু গ্রামের পুলওয়ামায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে হিজবুল মুজাহিদিনের কম্যান্ডার জাকির মুসার ঘনিষ্ঠ দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে তাদের নাম কিফায়ত এবং জাহাঙ্গির।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

জিএসটির প্রভাবে এফ এম সি জি দ্রব্যের মূল্যহ্রাস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জিএসটি চালু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু জিনিসের দাম কমতে শুরু করেছে। প্রখ্যাত বহুজাতিক হিন্দুস্থান ইউনিলিভার তাদের রিন সাবানের দাম কমিয়েছে। আবার ডাভ শ্যাম্পু এবং সার্ফ এক্সেল বারের দাম না কমলেও, পুরনো দামে আগের থেকে বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। আরও দুটি নামী ব্র্যান্ড ম্যারিকো এবং ডাবরও কিছু দিনের মধ্যে তাদের নতুন মূল্যতালিকা পেশ করবে। বেশ কিছু জিনিসের দাম যে কমবে সে ব্যাপারে তারা আশাবাদী।

অন্যদিকে একাধিক নির্মাতা-সংস্থা জানিয়েছে, জিএসটি লাগু হওয়ার ফলে যেসব জিনিসের সামান্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে সেই বাড়তি মূল্য তারা ক্রেতার ওপর চাপাতে চান না। গোদরেজ কমজিউমার প্রোডাক্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিবেক গম্ভীর বলেন, 'জিএসটির ফলে সাবানের দাম কমবে।

আমরা সেই সুবিধে ক্রেতাদের দিতে চাই। আবার যেসব জিনিসের সামান্য মূল্যবৃদ্ধি কোম্পানি বহন করতে সক্ষম আমরা তা ক্রেতাদের ঘাড়ে চাপাব না।' 'একই কথা শোনা গেছে বিখ্যাত পানীয় ব্র্যান্ড রসনার সিএমডি পিরাজ খামবাট্টার মুখেও।

উবাচ

"ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে সংযুক্ত করার (de-hyphenate) প্রবণতাকে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি।"

প্রধানমন্ত্রী মোদীর ইজরায়েল সফর প্রসঙ্গে।

ড্যানিয়েল কারমন
ভারতে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত

"এ আই এফ এফ-এর এখনই ইন্ডিয়ার সুপার লিগে বাংলার দুটি ক্লাবকে (মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল) অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।"

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে লেখা এক চিঠিতে।

রীতেশ তেওয়ারি
রাজ্য বিজেপির সম্পাদক

"আমি প্রায় মজা করে বলি, আমাদের পাঠ্য বইয়ে আলেকজান্ডার ও নেপোলিয়ন সম্পর্কে পড়েছি। কিন্তু বাজীরাও সম্পর্কে জানতে আমাদের ফিল্ম দেখতে হয়। এই ভণ্ডামি এখনই বন্ধ করতে হবে।"

সম্প্রতি এক ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে।

সুনীল আম্বেকর
অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পাদক

"ছাত্রদের বেতনভোগী কর্মী তৈরি করা নয়, তাদের শিক্ষা দেওয়াই পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্য। দুর্ভাগ্যবশত, পাঠ্যবই লেখা হচ্ছে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে... পাঠ্যসূচির এখন পুনর্বিচার প্রয়োজন।"

ব্রজবিহারী কুমার
আই সি এস এস আর-এর নবনিযুক্ত প্রধান

"কংগ্রেসের জন্যই উত্তরপ্রদেশ ও অসমে আমরা জোট গঠন করতে পারিনি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়েও কংগ্রেস আমাদের বিশ্বাস করেনি।"

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে।

নীতীশ কুমার
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী

এক দেশ, এক কর বিশ্বের দরবারে ভারতের অর্থনীতিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে

কালোটাকার কারবারিদের বড়ই দুঃসময় চলছে মোদী জমানায়। প্রথমে নোট বাতিল। তারপর ‘এক দেশ, এক কর’ নীতি। স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড় কর সংস্কারের মুখ দেখল সারা দেশ। সংসদের সেন্ট্রাল হলের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ১৪ বছরের দীর্ঘ যাত্রার চূড়ান্ত পরিণতি। জিএসটি ভারতীয় অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।’ রাজ্যে রাজ্যে করের হারে আর পার্থক্য রইল না। উঠে গেল রাজ্যের এবং কেন্দ্রের অতীতে চাপানো সব কর, সেস এবং সারচার্জ। একদা কংগ্রেসি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে সংসদে অভিন্ন পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) বিলটি কংগ্রেস সরকার পেশ করেছিল। ১৪ বছর পরে সোনিয়া গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, ‘যথাযথ পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এত তাড়াহুড়ো করে মোদীজী জিএসটি চালু করলেন।’ শুনলে মনে হবে ১৪ বছর সময়টা যথেষ্ট নয়। কমপক্ষে ৫০ বছর সময় দেওয়া উচিত ছিল। সোনিয়া-মমতা নোটবন্দির সময়ে প্রতিবাদে গলা ফাটিয়ে ছিলেন। তখনও তাঁরা বলেছিলেন দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হবে। এবারেও তাঁরা একই কথা বলছেন। এই উটকো পণ্ডিতদের কথায় কান দেবেন না। কথায় আছে, ‘পাগলে কি না বলে, ছাগলে...’।

যে কোনো পরিবর্তন যখন করা হয় তখন সাময়িকভাবে সাধারণ মানুষের কিছুটা অসুবিধা হয়। পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অসুবিধা হয়। দেশে যখন কম্পিউটার চালু হয় তখন দেশ জুড়ে বামপন্থীরা আন্দোলনে নেমেছিলেন। তখন প্রচার চলেছিল যে কম্পিউটার চালু হলে কর্মীদের চাকরি যাবে। টিভি ঘরে এলে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা উচ্ছন্নে যাবে। আজ দেশের ঘরে ঘরে টিভি কম্পিউটার চলছে। কম্পিউটার নেই এমন অফিস খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষ অভ্যাসের দাস। অভ্যাস পালটাতে বললেই আমাদের মনে হয় সব গেল। যাঁরা বলছেন, অভিন্ন পণ্য পরিষেবা কর বা জিএসটি চালু হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাঁদের বলতে বলুন কীভাবে সর্বনাশ হবে। বাজি রেখে বলতে পারি যে তাঁরা বলতে পারবেন না। জিএসটি চালু হওয়ার পর সাধারণ পণ্য ক্রেতাদের কোনো অসুবিধা নেই। শোরগোল তুলছেন খুচরো ব্যবসায়ীরা। যাঁরা এতকাল বছরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আয় করলেও কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারকে একটি টাকাও কর বাবদ দেননি। হ্যাঁ, এবার তাঁদের কর দিতে হবে। প্রতি মাসে তাঁরা কত টাকা ঘরে নিয়ে যান তার খুঁটিনাটি হিসেব কমার্শিয়াল এবং সার্ভিস ট্যাক্স দপ্তরের কম্পিউটারে ধরা থাকবে। আয়কর না মিটিয়ে সৎ ব্যবসায়ী সেজে থাকার দিন শেষ। তবে স্বীকার করছি যে সাময়িকভাবে ইন্টারনেটের সাহায্যে বেচাকেনার তথ্য জানাতে বা রেজিস্ট্রেশন করতে অজ্ঞতাজনিত কারণে প্রথমদিকে কিছুটা সমস্যা হবে। তারপর সড়গড় হয়ে গেলে দেখা যাবে বিষয়টা সহজ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল, যেসব ব্যবসায়ীর বার্ষিক টার্নওভার ২০ লক্ষ টাকা বা তার কম তাঁরা এখনই জিএসটির আওতায় আসছেন না। তাঁদের রেজিস্ট্রেশন দরকার নেই।

গূঢ় পুরুষের কলম

কেন্দ্র ও রাজ্যের ১৭টি পরোক্ষ করকে মিলিয়ে দিয়ে একটাই পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) তৈরি হয়েছে। জিএসটি শুধু নতুন করই নয়, নতুন একটি যুগ। এতকাল পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় আমরা অজস্র করের ভারে জর্জরিত ছিলাম। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে আলাদা আলাদা কর। জিএসটি চালু হওয়ার পর সব এক হয়ে গেল। এখন ভারতবাসীকে একটাই কর দিতে হবে। অভিন্ন পণ্য পরিষেবা কর। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, করের উপর কর চাপানোর পদ্ধতির অবসান ঘটানো। দেশে একটাই কর থাকলে করের উপর কর চাপানোর সুযোগ কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের থাকে না। করের ভার কমলে জিনিসের উৎপাদন ব্যয় কমে। তাই জিএসটি পণ্যের ও পরিষেবার খরচ বাড়িয়ে দেবে বলে মোদী বিরোধীরা যে প্রচার চালাচ্ছেন তা সত্যি নয়। বরং উল্টো। জিএসটি পণ্য ও পরিষেবার মূল্য কিছুটা কমাবে। দাম কমলে বাজারে চাহিদা বাড়বে। অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে তখন পণ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। অর্থাৎ, জিএসটি এমন একটা পরিস্থিতির জন্ম দেবে যাতে নতুন লগ্নি আসবে। আর নতুন লগ্নি আসার অর্থ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি। তাহলে কেন বলব না যে আমরা নতুন যুগে প্রবেশ করেছি। জিএসটি ব্যবস্থাটা অনলাইনের মাধ্যমে হবে। ফলে এখানে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরকারি আধিকারিকদের সরাসরি যোগাযোগের প্রয়োজন নেই। অথচ আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিদি রোজ সকালে টুইটারে বিবৃতি দিচ্ছেন, ‘মোদীবাবু ইন্সপেক্টররাজের ঘুষের ঢালাও ব্যবস্থা করে দিলেন।’ দিদিভাই, আপনাকে জানাই যে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই দীর্ঘকাল আগেই জিএসটি চালু হয়েছে। আপনি যে সম্প্রতি নেদারল্যান্ডস সফর করে এলেন সেখানে বহু বছর আগে থেকেই জিএসটি চালু আছে, সেখানকার সরকারি প্রতিনিধিদের কাছে খোঁজখবর নেবেন। মুড়ি খেয়ে হাঁটাহাঁটির জন্য কলকাতাতো আছেই। সভ্য দুনিয়ায় কী কী পরিবর্তন হয়েছে সেটা দেখাও তো আপনার মতো রাজনীতিকের কর্তব্য। পয়লা জুলাইয়ের মধ্য রাত্রে যখন গোটা দেশ নিদ্রামগ্ন তখন আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষ এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করল যে ব্যবস্থা গোটা বিশ্বেই বিদ্যমান। এক দেশ, এক কর ব্যবস্থা বিশ্বের দরবারে ভারতের অর্থনীতিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করল। ■

জিএসটি মানে সব্বোনাশ, মোদীর শুধু পৌষমাস

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

জি এস টি খায় না মাথায় দেয়? জি এস টি-র পুরো কথাটি কী? কেউ বলছেন 'গুডনাইট, সুইট ড্রিমস্, টাটা', কেউ বলছেন, 'গুষ্টির ষষ্ঠী পুজো'— এরকম আরও কতকিছু। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, 'গুড অ্যান্ড সিম্পল ট্যাক্স'। যদিও আসল কথাটি 'গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স' বা পণ্য ও পরিষেবা কর। দিদি অবশ্য নতুন কোনো শব্দবন্ধ তৈরি করে উঠতে পারেননি। আমি তো কিছুই বুঝিনি। তাই দিদি যা বলছেন তাতেই বিশ্বাস করছি। দিদি বলেছেন, জি এস টি মানে সব্বোনাশ আর মোদীর শুধু পৌষমাস।

চোখ বন্ধ করে ভাবুন তো, ডিসেম্বরের সেই দিনগুলো মনে পড়ছে কিনা। মনে পড়ছে এটিএম-এর সামনে লম্বা লম্বা লাইন, বাড়ির কাজের লোককে নগদ টাকায় মাসমাইনে দিতে গিয়ে হিমসিম। অটো রিক্সায় ভাড়া দিতে গিয়ে খুচরোর সমস্যা, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। ঝাপসা লাগছে না দিনগুলো? কারও হয়তো আর ভালো করে মনে পড়ছে না। এটাই তো স্বাভাবিক। দেখুন মাত্র ছ'মাস হয়েছে, কত হইচই, কত প্রতিবাদ, সবই তো মিইয়ে গেছে। সে অধ্যায় শেষ। এবার নতুন অধ্যায় শুরু। জি এস টি জমানা।

জি এস টি নিয়ে হইচইয়ের মাঝে একটি প্রশ্নই কিন্তু ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মনে। এতে জিনিসপত্রের দাম কমবে না বাড়বে? বাড়লে কতটা, কমলে কতটা? এর উত্তর অনেকে অনেকরকম ভাবে দেওয়ার চেষ্টা করলেও শুধুই কিছু শতাংশের হিসেব ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতিউতি। আর হোয়াটস্ অ্যাপের গ্রুপ জুড়ে কোথায়, কীসে, কত কর, তার লম্বা ফর্দ।

শাকসবজিতে বা চাল-ডালে জি এস টি লাগু হচ্ছে না বলেই শুনলাম। কম দামি জামা-কাপড়, জুতো সবই সস্তা হচ্ছে। আমার তো তাই আর কিছু নিয়ে বিশেষ আগ্রহ নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর জি এস টি-র প্রভাব না পড়ারই কথা। মানে রোজকার বাজার-হাটে দাম একই থাকবে ধরে নেওয়া যায়। তবু কোনদিক দিয়ে পকেট কাটা হবে, তা বুঝতে অনেক সময় লাগবে।

আসলে প্রধানমন্ত্রী হোন বা অর্থমন্ত্রী, জি এস টি-র সুফল বা কুফল ঠিক কীভাবে বা কতদিনের মধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবে তা জানেন বলে মনে হয় না। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের কথা ভেবে, নাকি ছোট বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কথা ভেবে জি এস টি-র প্রতিবাদ করছেন তাও ঠিক বোধগম্য হয় না। তবে দিদি একটা ন্যায্য কথা বলেছেন— মোদীর জি এস টি নীতিতে বলা হয়েছে কোনো ব্যবসায়ী কর না দিয়ে ঠকালে তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হবে। বছর পাঁচেক জেলও হতে পারে। এতেই ন্যায্য রাগ দিদির। তিনি স্পষ্ট করেছেন, অসাধু বলে কি মানুষ নয়! জেলে পোরা যাবে না। নারদে জেল, সারদায় জেল আবার জিএসটিতেও জেল হবে! তবে ভাইয়েরা কী করবে? তৃণমূল কংগ্রেসের কি একটা কারাগার শাখা খুলতে হবে নাকি?

যাক গে, আমার মতো আদার ব্যাপারির অত জি এস টি বুঝে কাজ কী বলুন তো! নোট বাতিলও কী আমরা বুঝেছিলাম বা যা বুঝেছিলাম তার সবটা কি মিলেছে? যতটা ভয় পেয়েছিলাম ততটা কি ভুগেছি? তবে শুনেছি অনেক কালো ব্যবসায়ী পথে বসেছেন। সুইক ব্যাঙ্কে টাকা পাচার করাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার জি এস টি চালু হওয়ায় লোকঠকানো, দেশ ঠকানো বন্ধ হবে। একটা একটা করে ধরা পড়ার খবর কাগজে পড়ব আর হাততালি দেব। আর খরচ বাড়া-কমা? আরে ও তো কতই বেড়েছে-কমেছে। দু'দশ টাকা বাড়লে আর এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হবে বলুন তো! সিগারেটের দাম তো দিনকে দিন বাড়ছে, কতজন সিগারেট খাওয়া বন্ধ করেছে? প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড বা মোবাইল ব্যবহার করতে গিয়ে যদি একটু বেশি খরচ করতেও হয়, তা তো দেশের জন্যই করব, তাই না? নোটবাতিলের পরেও উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে একের পর এক নির্বাচনে তো মোদী জিতে গিয়েছেন। দিদি ছাড়া সবার কাছেই তো নোটবাতিল ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। জি এস টি-র সঙ্গেও আমরা মানিয়ে নেব। পৃথিবী উল্টে যাচ্ছে না। আপনার খাওয়া-দাওয়াও বন্ধ হচ্ছে না। কাজেই অতশত না ভেবে আসুন হাততালি দিই। খুব জোরে। যাতে কোনো 'অপপ্রচারের' আওয়াজ কানে না যায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'নতুন চশমা পরলে প্রথম কিছুদিন সমস্যা হয়, কিন্তু পরে অভ্যাস হয়ে যায়।'

— **সুন্দর মৌলিক**

পাহাড় হাসছে, এই কৃতিত্ব দাবি করেছিলেন, এখন পাহাড় জ্বলছে এই ব্যর্থতাও মুখ্যমন্ত্রীরই

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

ছত্রধর মাহাতোকে মনে আছে? ছত্রধর মাহাতো হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যাঁর হাত ধরে, মাওবাদীদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতায় জঙ্গলমহলে পা রেখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছত্রধরের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর একান্ত বৈঠকের মহার্ঘ ফোটোগ্রাফটি এখনও অনেক সংবাদপত্রের আর্কাইভে সযত্নে রক্ষিত আছে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এবং লালগড় আন্দোলনের সময়কার সংবাদপত্রের পাতাগুলি ওল্টালে যে কেউ দেখতে পাবেন, ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে ছত্রধর এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুখের বিবরণ। লালগড় আন্দোলনের পর্বটিতে যখন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এক বিস্তীর্ণ অংশে মাওবাদীরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদপুষ্ট বিদ্বজ্জনেরা বারে বারে জঙ্গলমহলে ছুটে গিয়ে মাওবাদীদের সহযোগী ছত্রধরের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। পরবর্তীকালে মাওবাদী নেতারা দাবি করেছেন, নন্দীগ্রামের আন্দোলনে তাঁরা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে মাওবাদী নেতা কিষেণজী রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। যে মাওবাদীরা সংসদকে শুয়োরের খোঁয়াড় মনে করে এবং নির্বাচন বয়কটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে, ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের সময় পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলে তারাই গ্রামবাসীদের ভিতর ফতোয়া জারি করেছিল বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য। যে জঙ্গলমহল এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, সিপিএমের গুণ্ডাবাহিনীর দাপটে চৌত্রিশ বছরে যে অঞ্চলে তৃণমূল নেত্রী একটিও ঘাসফুল ফোটাতে পারেননি, মাওবাদীদের সন্ত্রাসের রাজনীতির কাঁধে ভর করে, ২০১১-র নির্বাচনে সেই জঙ্গলমহলে পা রাখলেন তৃণমূলেশ্বরী।

কিন্তু তারপর কী হলো? ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূলনেত্রী উপলব্ধি করলেন--- ছত্রধর এবং কিষেণজীর প্রয়োজন তাঁর কাছে ফুরিয়েছে। তৃণমূল নেত্রী এও উপলব্ধি করলেন যে, এরপরও ছত্রধর এবং কিষেণজীর হাত ধরে চললে, নানাবিধ প্রশ্নের মুখোমুখি পড়তে হবে তাঁকে। ক্ষমতা দখল করার জন্য যে যে মই ব্যবহার করা দরকার, তার ভিতর একটি মই ছিল এই ছত্রধর এবং কিষেণজী। উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যাওয়ার পরে এবার এদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই বিবেচনার কাজ বোধ করলেন তৃণমূল নেত্রী। অতএব, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় ছত্রধরের স্থান হলো হাজতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন— ছত্রধরের এই হাজতবাস ততদিন অন্তত চলবেই— এ হলপ করে বলা যায়। যে কিষেণজী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মুখ্যমন্ত্রী' দেখতে চেয়েছিলেন, সেই কিষেণজীকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ 'এনকাউন্টারে' মারল। এই 'এনকাউন্টার' নিয়েও অবশ্য পরে নানাবিধ প্রশ্ন উঠেছে। শোনা যায়, কিষেণজীর এক ঘনিষ্ঠ মহিলা সহকর্মী অর্থের বিনিময়ে কিষেণজীকে ভুলিয়ে এনে পুলিশের হাতে তুলে দেন। এবং তারপর 'এনকাউন্টার' হয়। কিষেণজীর সেই মহিলা সহকর্মী বর্তমানে এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতার ঘরণী হয়ে সুখে সংসার করছে। জঙ্গলমহলে নিজের রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করে, ছত্রধরকে হাজতে ঢুকিয়ে, কিষেণজীকে হত্যা করে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী দাবি করলেন— জঙ্গলমহল হাসছে। যদিও এই হাস্যমুখর জঙ্গলমহলে এখনও তাঁর দলের নেতারা দেহরক্ষী ছাড়া চলাফেরা করার কোনো ঝুঁকি নেন না। হয়তো ভবিষ্যতে পাহাড়ের মতো বোঝা যাবে, জঙ্গলমহল কোন হাসিটা হাসছে--- আনন্দের, না বিদ্রূপের!

ঠিক তেমনই পাহাড়েও। বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে জিটিএ চুক্তিতে সই করার পর মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন 'পাহাড় হাসছে।' দাবি করেছিলেন, তিনি তুড়ি মেরে তিনি পাহাড় সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন। তাঁর এই আত্মগর্বী দাবির সমর্থনে বশংবদ সংবাদমাধ্যমও ঢাক পিটিয়ে প্রচার করা শুরু করেছিল। তাঁর এই দাবি যে কতটা অসার ছিল— তা অবশ্য এখন প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। ক্ষমতায় আসার পর ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) চুক্তি ও আইন তৈরি করে। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল এই চুক্তি ও আইনে গোর্খাল্যান্ড শব্দটি ঢোকালেন কেন তিনি। অহংসর্বস্ব মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন— 'হোয়াটস ইন এ নেম?' নামে কী আসে যায়। গোর্খাল্যান্ড নামে যে অনেক কিছুই আসে যায়— তা বোঝার

মতো রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং প্রাজ্ঞতা কোনোটাই মুখ্যমন্ত্রীর ছিল না। গোর্খাল্যান্ড চুক্তির দিনও গুরুংকে পাশে বসিয়ে যখন সভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী, তখনও গোর্খাল্যান্ডের পক্ষে স্লোগান উঠেছিল ওই সভায়। ওই সময়কার সংবাদপত্রগুলি ওল্টালেই সে সম্পর্কিত সংবাদ দেখতে পাবেন সকলেই। শ্রীমতী যে আগুন নিয়ে খেলতে শুরু করেছেন, সেদিনই বোঝা গিয়েছিল। আসলে এখানেও ক্ষমতা দখলের উদগ্র বাসনায় সেই জঙ্গলমহলের মতো খেলাই খেলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী। পূর্ববর্তী বাম জমানায় বা পরবর্তীকালে সুবাস ঘিসিং-বিমল গুরুংদের পাহাড়ে তাঁর দলের যে-কোনো অস্তিত্বই নেই— তা জানতেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি বুঝেছিলেন, এই পাহাড় দখল করতেও তাঁর একটি মই দরকার। এই মই হিসেবেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন বিমল গুরুংকে। সুবাস ঘিসিংকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে বিমল গুরুং যখন সন্ত্রাসের মাধ্যমেই পাহাড় দখল করেছিলেন, তখন এই মুখ্যমন্ত্রীই হাত প্রসারিত করেছিলেন গুরুংয়ের প্রতি। গুরুংও প্রতিদানে তাঁকে 'মা' সম্বোধন করতে দ্বিধা করেননি। সেই রাজনৈতিক মধুচন্দ্রিমার সচিত্র সংবাদও সব সংবাদপত্রের আর্কাইভে সযত্নে রক্ষিত আছে। কিন্তু বিমল গুরুংকে জিটিএ-র ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়ে খেলা শেষ করে দেবেন— এমন বান্দা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নন। সমস্ত ক্ষমতা তাঁর একার হাতে কুক্ষিগত হোক— এটাই তাঁর মনোগত বাসনা। অতঃপর একটি নোংরা খেলা খেলতে শুরু করলেন তিনি পাহাড়ের মানুষদের দিয়ে। তিনি এবং তাঁর অনুগামী অরূপ-স্বরূপ-স্বগুণ-নির্গুণরা ঘনঘন পাহাড়ে যেতে শুরু করলেন। শুরু হলো পাহাড়ে বিভিন্ন জনজাতি-উপজাতিদের ভিতর কাঁচা টাকা বিলানো। ভুটিয়া-লেপচা ইত্যাদি একগুচ্ছ উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের নামে পাহাড়ের মানুষকে বিভাজনের খেলায় মাতলেন মাননীয়া। বুঝলেনই না, পাহাড়ের আন্দোলনটি আসলে জাতিসত্তার আন্দোলন। এই আন্দোলনের পিছনে একটি জাতির আবেগ কাজ করে। টাকা ছড়িয়ে বা কলকাতা থেকে গুণ্ডা পাঠিয়ে এই আন্দোলনকে দমন করা যায় না। এর জন্য যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দরকার, সেটি যে তাঁর নেই— তা আবার প্রমাণ করে ছাড়লেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী।

পাহাড় হাসছে এবং এই হাসির সব কৃতিত্ব তাঁর একার--- এমন দাবিই করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দাবি করেছিলেন, ক্ষমতায় এসে তিন তুড়ি মেরে তিনি পাহাড় সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। কৃতিত্ব যখন দাবি করেছিলেন, আজ যখন পাহাড় জ্বলছে— তার দায়টাও তিনি নেবেন তো? বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়ার বিপদটি যে কী--- সেটা তিনি সম্যক বুঝছেন তো এখন? বিমল গুরুং এবং তাঁর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা পাহাড়ে যে হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু করেছেন— তা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। হিংসা কখনই পাহাড় সমস্যার সমাধানের পথ দেখাবে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী গত ছ' বছর ধরে পাহাড় নিয়ে যে রাজনীতি করে এসেছেন— তা কি সমর্থনযোগ্য? তাঁর রাজনীতিই কি আজ পাহাড়ে আগুন লাগায়নি? চুক্তিতে এবং আইনে গোর্খাল্যান্ড শব্দটি থেকে তিনিই কি স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে প্রথম থেকেই পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে বসেননি? আজ উল্টো কথা বলে কী লাভ? ক্ষমতা দখলের মোহে লেপচা-ভুটিয়া ইত্যাদি আলাদা আলাদা পর্ষদ গঠন করে পাহাড়ে বিভাজনের রাজনীতি করলেন কেন তিনি? এটুকু বুঝলেন না যে, তাঁর এই অবিবেচনাপ্রসূত কাজের জন্য পাহাড়ে আরও জাতিবিদ্বেষ তৈরি হবে? গুরুংয়ের প্রয়োজন যখন তাঁর কাছে ফুরিয়েছে, তখন তিনি জিটিএ-তে অডিটের কথা বলছেন। জিটিএ-তে আর্থিক দুর্নীতি হয়ে থাকলে এতদিন অডিট করার প্রয়োজনীয়তা কেন উপলব্ধি করেননি মুখ্যমন্ত্রী? মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের সুবিধাবাদী রাজনীতি কিন্তু রাজ্যের মানুষ ক্রমেই ধরে ফেলছেন। মাত্র কয়েকমাস আগে যে সেনাবাহিনীকে তিনি 'তোলাবাজ' বলেছিলেন, নবান্ন দখল করতে আসছে বলে যে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করেছিলেন— মজার কথা হলো, পাহাড় অশান্ত হওয়ার পর তাঁর পুলিশ বাহিনী যখন পুরোপুরি ব্যর্থ— তখন এই সেনার সাহায্যই নিতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী। আক্রান্ত দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের ফেলে রেখে রাতের অন্ধকারে এই সেনাবাহিনীর পাহারায় পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সেনাবাহিনীর পাহারাতেই মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রীসভার সদস্য এবং দলের নেতারা চোরের মতো লুকিয়ে পাহাড় ত্যাগ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেবাদাস অনেকেই বিগলিত কণ্ঠে বলছেন, এই প্রথম একজন মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে দাঁড়িয়ে বিমল গুরুংদের মোকাবিলা করার সাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু এটা বলছেন না, নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থেকে গরম গরম কথা বলে, পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে বুঝেই রাতের অন্ধকারে পাহাড় থেকে চম্পট দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে এই অশান্তির পিছনে বিজেপির হাত দেখলেন। এখন বলছেন, একটি বিদেশি রাষ্ট্র এই আন্দোলনে মদত জোগাচ্ছে। মজার কথা হলো, নাগাল্যান্ডের একটি জঙ্গি গোষ্ঠী যে পাহাড়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে মদত দিচ্ছে— এমন তথ্য কিন্তু কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা অনেক আগেই রাজ্যকে দিয়েছিল। এই রাজ্যের পুলিশ কর্তারা তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। রাজ্যের পুলিশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর কী উত্তর দেবেন?

পশ্চিমবঙ্গের কোনো অঞ্চলেই কোনো বিশৃঙ্খলা বা সন্ত্রাস কখনই কাম্য নয়। কেউই তা চায় না। পাহাড়ের সমস্যাও সন্ত্রাসে নয়, আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান হোক— সেটাই সবাই চায়। কিন্তু কেউ যখন স্রেফ ব্যক্তিগত স্বার্থ, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উদগ্র বাসনায়, আগুন নিয়ে খেলতে শুরু করেন, সমগ্র রাজ্যটিকেই এক বৃহৎ জতুগৃহে পরিণত করেন— তাঁর বিচার কে করবে? ■

ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

অমলেশ মিশ্র

ভারতবর্ষের সংবিধানের ৫২ নং ধারায় বলা হয়েছে--- দেয়ার স্যাল বি এ প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া। আর ৫৩ ধারায় বলা হয়েছে— দি এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অব দি ইউনিয়ন শ্যাল বি ভেস্টেড ইন দি প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড শ্যাল বি এক্সারসাইজড্ বাই হিম আইদার ডাইরেক্টলি অর থ্রু দি অফিসারস্ সাবোরডিনেট টু হিম ইন অ্যাকরড্যান্স উইথ দি কনস্‌টিটিউশন।

ভারতবর্ষের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন। শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা তাঁর হাতেই থাকবে। তিনি সেগুলি প্রয়োগ/ব্যবহার করবেন সরাসরি ভাবে নিজেই অথবা তাঁর অধীনে কার্যকর্তাদের দ্বারা এবং এই প্রয়োগ/ব্যবহার সংবিধান নির্দিষ্ট পথেই করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান ব্যক্তি। তিনি দেশের সর্বাপেক্ষা উচ্চ সম্মানের অধিকারী। সংবিধানের ৫৩ নং ধারায় তাকে শাসন সংক্রান্ত সমূহ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যতীত তাঁর আইন সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত কিছু ক্ষমতাও সংবিধানে উল্লিখিত হয়েছে।

ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশের শাসনভার বা শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা মন্ত্রীপরিষদই প্রকৃতপক্ষে প্রয়োগ/ব্যবহার করেন এবং মন্ত্রীপরিষদের প্রধানব্যক্তি হলেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতিই নিয়োগ করেন এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে মন্ত্রী পরিষদের অন্যান্যদের নিয়োগ করেন।

সংবিধানের ৭৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, দেয়ার স্যাল বি এ কাউন্সিল অব মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, অ্যাট দি হেড টু এইড অ্যান্ড অ্যাডভাইস্ দি প্রেসিডেন্ট, হু শ্যাল, ইন দি এক্সারসাইজ অব হিজ ফাংসনস্, অ্যাক্ট ইন অ্যাকরডেন্স উইথ সাচ অ্যাডভাইস।

রাষ্ট্রপতি সব কাজই মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ মতো করবেন। মন্ত্রী পরিষদের কাজ হলো রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়া। ভারতবর্ষের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হলেও, সেই ক্ষমতার প্রয়োগ এবং ব্যবহার মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শের উপর নির্ভরশীল। এবং সেই মন্ত্রী পরিষদের প্রধান ব্যক্তিটি হলেন--- প্রধানমন্ত্রী। তাই বলা হয়ে থাকে যে, রাষ্ট্রপতি আলঙ্কারিক প্রধান। আসল কর্তৃত্ব থাকে প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রী পরিষদের হাতে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যে সাংবিধানিক প্রধান সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি প্রতি ৫ বছর অন্তর নির্বাচিত হন। অর্থাৎ একজন রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ৫ বছরের। সংবিধানের ৫৬ নং ধারায় তা উল্লিখিত হয়েছে। তবে তার আগে তিনি পদত্যাগ করতে পারেন বা তাঁকে অপসারিত করা যেতে পারে। অপসারণ করার পদ্ধতিও সংবিধানে উল্লিখিত আছে। রাষ্ট্রপতিকে পদ থেকে অপসারণ করার বিষয়ে সংবিধানের ৬১ নং ধারায় বলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁকে শপথ নিতে হয় যে তিনি ভারতবর্ষের সংবিধানকে রক্ষা করবেন এবং দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য সাধ্য অনুসারে কাজ করবেন।

সংবিধানের ৫৮ নং ধারায় যা বলা আছে, সেই অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে ভারতের নাগরিক হতে হবে, ৩৫ বছর বয়স হতে হবে এবং লোকসভার সদস্য হওয়ার জন্য যা যা যোগ্যতা আবশ্যক সেইসব যোগ্যতা থাকতে হবে। যেহেতু সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন, সেহেতু প্রতি ৫ বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রয়োজন হয়।

আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ৫ বছর আগে ২০১২ সালে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ২০১৭ সালের ২৪ জুলাই তাঁর কার্যকাল শেষ হচ্ছে। সেই জন্য তার আগেই রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন হবে ১৭ জুলাই এবং যাঁরা ওই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান, তাঁদের ২৮ জুনের মধ্যে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে হয়েছে। নির্বাচন করাবেন ভারতের নির্বাচন কমিশন।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সরাসরি জনসাধারণের ভোটে হয় না। জনসাধারণ, পূর্বানুষ্ঠিত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে যাদের সাংসদ ও বিধায়ক নির্বাচিত করেছিলেন তাদের ভোটেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের সংবিধানের ৫৪নং ধারাটি উল্লেখ করেছে--- দি প্রেসিডেন্ট শ্যাল বি ইলেকটেড বাই দি মেম্বারস্ অব অ্যান ইলেকট্রোরাল কলেজ কন্‌সিসটিং অব—

(ক) দি ইলেকটেড মেম্বারস অব বোথ হাউসেস অব পার্লামেন্ট, অ্যান্ড

(খ) দি ইলেকটেড মেম্বারস্ অব দি লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিস অব দি স্টেটস।

ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ালো যে, সংসদের লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্য

এবং রাজ্যগুলির বিধানসভার সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিকে ভোট দেবেন লোকসভার ৫৪৫ সদস্য + রাজ্যসভার ২৫০ সদস্য এবং ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের বিধানসভার সদস্য ৪১২০ জন। কিন্তু এইবার এই নির্বাচনে লোকসভা ও রাজ্যসভার ৭৭৬ জন সদস্য এবং বিধানসভাগুলির ৪১২০ জন সদস্য ভোট দেবেন।

কিন্তু মজা হলো, একজন সদস্যের ভোট ১টি নয়। লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রত্যেক সদস্যের ভোট মূল্য ৭০৮ এবং বিধানসভার একজন সদস্যের ভোট মূল্য কারোর ক্ষেত্রে ৭ আবার কারোর ক্ষেত্রে ২০৮। এই বিষয়টি নির্ধারিত হয় সংবিধানের ৫৫নং ধারা অনুসারে। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া যা নির্ধারিত হয় প্রত্যেক রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা ও বিধানসভার সদস্য সংখ্যার মধ্যে একটি অনুপাতের ভিত্তিতে যা এই ৫৫ নং ধারায় বলা হয়েছে। ভোট নেওয়া হবে গোপন ব্যালট পেপারের মাধ্যমে। ২০১১ সালে যে জনগণনা হয়েছিল সেই জনগণনায় যে লোকসংখ্যা পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে এবং একটি রাজ্যের বিধানসভার সদস্য সংখ্যা কত তার ভিত্তিতে। এই পদ্ধতিতে হিসাব করে পাওয়া গেছে প্রত্যেক সংসদ সদস্যের ভোট মূল্য ৭০৮। বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা সদস্যের ভোট মূল্য পৃথক। যেমন, উত্তরপ্রদেশের একজন বিধানসভা সদস্যের ভোট মূল্য ২০৮ কিন্তু সিকিম বিধানসভার একজন সদস্যের ভোট মূল্য ৭। আবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সদস্যের ভোট মূল্য ১৫১, গুজরাট-১৪৭, ঝাড়খন্ড-১৭৬, তামিলনাড়ু-১৭৩, অন্ধ্র প্রদেশে- ১৪৮, বিহার-১৭৬, মহারাষ্ট্র-১৭৫, ওড়িশা-১৪৯।

এইভাবে সাংসদ ও বিধায়কদের ভোটমূল্য যোগ করলে--- এবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট সংখ্যা সর্বমোট ১০ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৮২। ফলে যে প্রার্থী ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪৪২টি ভোট পাবেন তিনিই রাষ্ট্রপতি হবেন এবং ২৪ জুলাই ২০১৭ সাল থেকে পাঁচ বছর রাষ্ট্রপতি পদে থাকবেন। তিনি পদত্যাগ করলে বা অপসারিত হলে কার্যকাল কমে যাবে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাজনীতি :

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন রাজনীতির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। যে দলের বা যে গোষ্ঠীর সাংসদ ও বিধায়কদের ভোটসংখ্যা বেশি তাঁদের প্রার্থীই জয়ী হয়ে থাকেন— তাঁর গুণপনা বিচার করার সুযোগ থাকে না। শ্রীমতী প্রতিভা পাতিল কোন গুণপনায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তা আজও গবেষণার বিষয়।

এবারের নির্বাচনে এনডিএ-র জয়ের সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি। এই যে ১০ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৮২ ভোটের হিসাব জানা গেল তার ৪৮.১০ শতাংশ ভোটই এনডিএ ভুক্ত দলগুলির। ইউপিএ অর্থাৎ কংগ্রেস গোষ্ঠী ১৫.৯০ শতাংশ। এনডিএ বা বিজেপি নেতৃত্বের গোষ্ঠীর মধ্যে না হওয়া সত্ত্বেও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এবং ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী এনডিএ প্রার্থীকে সমর্থন করবেন জানিয়েছেন। তার ফলে এনডিএ ইতিমধ্যেই ৬১ শতাংশ ভোট নিশ্চিত করেছে।

এনডিএ বিরোধী দলগুলির মধ্যে সিপিএম, কংগ্রেস, মমতা ব্যানার্জী, লালুপ্রসাদ যাদবরা বিজেপি বিরোধী রোগে আক্রান্ত। রাজনৈতিক লড়াই নিশ্চয়ই দোষের নয় কিন্তু এরা লড়াইটাকে নরেন্দ্র মোদী বিরোধী করে ফেলেছেন, যা নিন্দনীয়। এবং এদের মধ্যে মমতা ব্যানার্জীর ভূমিকা বেদনাময় ভাবে হাস্যকর।

বিরোধীরা ২৬ মে ও তার আগে এবং সর্বশেষ ২২ জুন ১৭ দলের একটি গোষ্ঠী তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা প্রার্থী হিসাবে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা বাবু জগজীবন রামের কন্যা শ্রীমতী মীরা কুমারকে পছন্দ করেছেন। মীরা কুমার লোকসভার অধ্যক্ষও ছিলেন ৫ বছর। তাঁদের যুক্তি— শ্রীমতী মীরা কুমার দলিত সম্প্রদায়ের। অর্থাৎ এই দলগুলি এখনও জাতপাত এর উপর দাঁড়িয়ে রাজনীতি করতে চান--- এই একবিংশ শতাব্দীতেও। এরপরেও এরা দাবি করেন এরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

অপর দিকে এনডিএ গোষ্ঠীতে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন পত্র পেয়েছেন রামনাথ কোবিন্দ। ইনি বিহারের রাজ্যপাল ছিলেন। ইনি সম্প্রদায়গত ভাবে দলিত হলেও এনডিএ ওই প্রসঙ্গটি প্রচারে আনছে না, আনা উচিতও নয়। শ্রীমতী মীরাকুমারের অন্যান্য গুণপনায় উপরে গুরুত্ব না দিয়ে তার দলিত চরিত্রের উপর গুরুত্ব দিয়ে খুব হতাশাব্যঞ্জক বার্তা দিল ইউপিএ।

রামনাথ কোবিন্দ মনোনয়ন পেশ করার পর ভোটের চিত্র দাঁড়ালো এইরকম— বিজেপি পরিচালিত এনডিএ জোট ৬২.৪০ শতাংশ ভোটের আশা করতে পারে—

এনডিএ --- ৪৮.৬০ শতাংশ, জেডিইউ --- ১.৮৯ শতাংশ, এআইএডিএমকে --- ৫.৩৯ শতাংশ, বিজেডি— ২.৯৯ শতাংশ, টিআরস— ২.০০ শতাংশ, ওয়াই এল আর কংগ্রেস— ১.৫৬ শতাংশ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে নিশ্চিতভাবে আশা করা যায় যে রামনাথ কোবিন্দ পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হবেন। কিন্তু প্রশ্ন থাকবে একটাই যে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির অনুকূলে থাকবেন অথবা মিশ্র সংস্কৃতির প্রবক্তাদের পুষ্ট করবেন। ভারতবর্ষ এই সত্তর বছরেও জাপানের মতো যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি ছোট দেশের সমান উন্নত হতে পারেনি— নিজের দেশের সংস্কৃতিকে গুরুত্ব না দিয়ে মিশ্র সংস্কৃতির লেজ ধরে থাকায়। এদেশের সরকার সংখ্যালঘু তোষণের রাস্তা ত্যাগ করেনি। তার ফলে হাজার রকম সমস্যায় জর্জরিত। যে দেশের সরকার ৬৫ বছর ধরে কেবল সাম্প্রদায়িকতার সাধনা করেছে সে দেশকে হিন্দু সংস্কৃতি ভিত্তিক অসাম্প্রদায়িকতার তপস্যা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সবকা সাথ, সবকা বিকাশ সেই তপস্যার মন্ত্র। ■

কেন মানা হচ্ছে না লিংডো কমিশনের সুপারিশ?

‘সেন্ট জেভিয়ার্স মডেলে’র মাধ্যমে ক্ষমতা কায়েম করাই শাসকদলের লক্ষ্য

অভিমন্যু গুহ

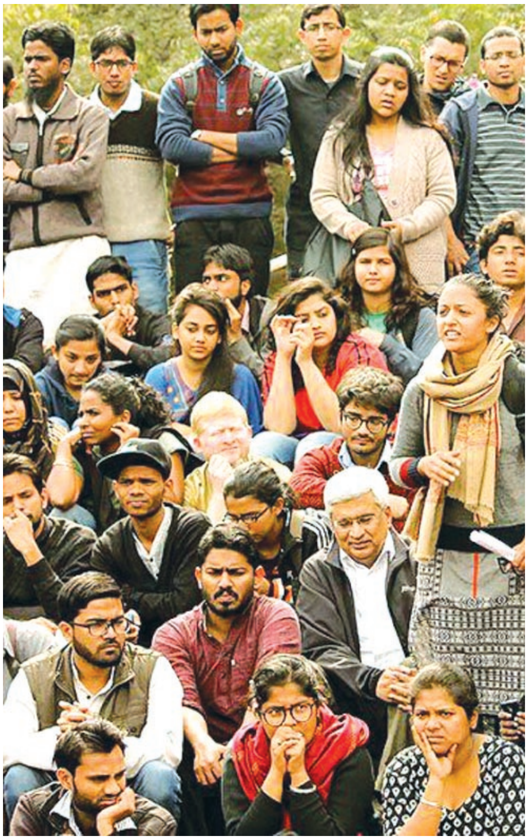

সম্প্রতি রাজ্য সরকার বিভিন্ন কলেজে লাগাতার গণ্ডগোলের পরিপ্রেক্ষিতে সেন্ট জেভিয়ার্স মডেলে ছাত্রভোট আয়োজনের কথা বলায় অনেক মহলেই রীতিমতো প্রশংসা পাচ্ছে। এমন কথাও বলা হচ্ছে যে এর ফলে ছাত্রেরা পড়াশোনায় মনযোগী হবে, ছাত্রভোটের উন্মাদনা কমবে ও রাজ্যে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে। কিন্তু বিষয়টি দু'য়ে দু'য়ে চারের মতো এতটা সহজ নয়। এর পেছনে রাজ্যের সদিচ্ছার বিষয়টিও যুক্ত রয়েছে। ছাত্র-রাজনীতি যে রাজনৈতিক রঙে কলুষিত হচ্ছে দেশের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত আজ থেকে একযুগ আগেই তা উপলব্ধি করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই ২০০৬ সালে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জে এম লিংডোর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশন পরবর্তী সময়ে যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে ছাত্র-নির্বাচনকে সরাসরি রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করার সুপারিশ ছিল।

এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে লিংডো কমিশন ছাত্রভোটে অংশগ্রহণকারী নির্বাচকের বয়স স্নাতক স্তরের জন্য ন্যূনতম ১৭ ও সর্বোচ্চ ২২ বছর ঠিক করে। স্নাতকোত্তর স্তরের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স ২৪ ধার্য করা হয়। অন্যদিকে পেশাদার কলেজ যেখানে কোর্সগুলি চার কিংবা পাঁচ বছরের ব্যবধানে সম্পন্ন হয় বা গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীদের ভোটদানে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচকের বয়সের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স ঠিক হয় ২৮ বছর। এর পাশাপাশি লিংডো কমিশন সুপারিশ করে যে ছাত্রভোটে নির্বাচক-মণ্ডলীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হাজিরা কম পক্ষে ৭৫ শতাংশ থাকতেই হবে। প্রতিযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে পদাধিকারীদের জন্য একটি পদে লড়াইয়েরই সুযোগ থাকবে এবং কার্যকরী সদস্যদের জন্য দু'টি সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। লিংডো কমিশন আরও বলেছিল যে-কোনো ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে যদি ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকে তাহলে ছাত্রভোটে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কমিশন তার রিপোর্টে আরও বলেছিল যে ছাত্রভোটে অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকার বেশি কোনোমতেই খরচ করতে পারবে না।

লিংডো কমিশনের এই রিপোর্ট সারা দেশে তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গের জন্য আরও বেশি প্রযোজ্য। কারণ এখানে ছাত্রভোটে যাঁরা লড়াই করেন এদের অধিকাংশই দীর্ঘদিন ধরে কলেজ দাপাচ্ছে, বয়সের গাছপাথরের বালাই নেই, রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় কলেজে কলেজে মাতব্বরি করে। লিংডো কমিশন নির্বাচনের বয়স বেঁধে দেওয়ায় এই মাতব্বরদের নির্বাচনে লড়ার সুযোগ থাকতো না, ফলে কলেজে শিক্ষার একটি পরিবেশ অন্তত গড়ে তোলা যেত। তার ওপর পশ্চিমবঙ্গে এমন কিছু প্রথম সারির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলি বাম আমলে তো বটেই এমনকী পরিবর্তনের জমানাতেও বামপন্থী ছাত্র-সংগঠনগুলির রমরমা দিব্যি বজায় রয়েছে।

লিংডো কমিশনের সুপারিশ চালু হলে সবচেয়ে বিপদে পড়তো তারা। এমনিতে ‘শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব’ বুলি আওড়ালেও বিপ্লব করলে যে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যায় না এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল তারা। তাই ছাত্রভোট প্রার্থীর প্রতিষ্ঠানে হাজিরার হার ন্যূনতম ৭৫ শতাংশ বেঁধে দেওয়ায় সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছিল তারা। লিংডো কমিশনের সুপারিশের বিরোধিতায় একযোগে বামপন্থীরা সরব হয়েছিল। এনিয়ে দিল্লিতে জেএনইউ-তে, কলকাতার যাদবপুরে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি গেল গেল রব তুলেছিল।

লিংডো কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার পক্ষে ছিল একমাত্র দেশের সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। বিদ্যার্থী পরিষদ ছাত্র রাজনীতিকে বরাবরই দলীয় রাজনীতি মুক্ত করার পক্ষে। তাদের এই বক্তব্য যে নেহাত কথার কথা নয়, তার প্রমাণ জরুরি অবস্থার পরে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত চার চারটি

জেএনইউ-তে লিংডো কমিশনের বিরুদ্ধে বামপন্থী ছাত্রছাত্রীরা (মাঝে প্রকাশ কারাত)।

বছর বিদ্যার্থী পরিষদ কোনও ছাত্র নির্বাচনে অংশ নেয়নি। যদিও জনতা সরকারের আমলে দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠনটির প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি এবং ভোটে দাঁড়ালে জয় অনিবার্যই ছিল। বিদ্যার্থী পরিষদের সঙ্গে বিজেপির সম্পর্ক নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে থাকেন। রাজনৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিদ্যার্থী পরিষদের মধ্যে কিছু মৌলিক ঐক্য থাকতেই পারে। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্ব বিদ্যার্থী পরিষদ নিয়ন্ত্রণ করেন— এই প্রমাণ কেউ দিতে পারবেন না। পরিষদ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছাত্র সংগঠন। সর্বভারতীয় থেকে শাখাস্তর পর্যন্ত এর সভাপতির দায়িত্বে একজন স্থায়ী কার্যকর্তা, যিনি মূলত শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী হিসেবে শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত তিনি থাকেন আর সম্পাদকের দায়িত্বে ছাত্র-ছাত্রীরাই থাকেন। পরিষদের সাংগঠনিক ভার, পূর্ণ সময়ের কার্যকর্তা যাঁরা সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্বে থাকেন, তাঁদের ওপরই বর্তায়। এঁরা কোনো রাজনৈতিক দলের তাঁবেদার নন— সুতরাং প্রকৃত ছাত্ররাই ছাত্র-সংসদের মাথায় বসুক, রাজনৈতিক নেতারা নন— আদর্শগত কারণেই বিদ্যার্থী পরিষদ এর পক্ষপাতী। লিংডো কমিশনের মাধ্যমে এই আদর্শের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে মনে করেছিল বলেই পরিষদ বিষয়টিকে সমর্থন করেছিল।

বামপন্থী দলগুলি বরাবরই পার্টির মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চেয়েছে এবং দেশের আগে দলকে স্থান দিয়েছে। সুতরাং লিংডো কমিশন এদের গাত্রদাহ বাড়িয়েছে। ছাত্র-সংসদ যদি ছাত্রদের দ্বারাই পরিচালিত হয় তবে আর পলিটব্যুরো করবে কী? দেশবিরোধী স্লোগানগুলোই বা আর দেওয়া যাবে কী করে? মগজধোলাইয়ের কল যে সর্বদাই সক্রিয় থাকবে তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসকদলের অবশ্য এসবের দায় নেই। ছাত্র-সংসদ যে রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েমের যন্ত্র ক্ষমতায় আসার পর দিব্যি এটা উপলব্ধি করে ফেলেছে তারা। যদি রাজ্যে শিক্ষার পরিবেশ ফেরানোর সদিচ্ছা থাকতো, তাহলে লিংডো কমিশনের সুপারিশগুলো কার্যকর করলেই ল্যাঠা চুকে যেত। 'সেন্ট জেভিয়ার্স মডেল' ফলো করতে হতো না, সুদূর সিঙ্গুরে নিয়ে গিয়ে নিজেরই ছাত্র-সংসদেরই সদস্যকে দিয়ে কলেজ স্কোয়ারে গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার সুপারিশ করাতে হতো না।

'সেন্ট জেভিয়ার্স মডেল' হলো ছাত্ররাই ছাত্র প্রতিনিধি বাছবেন এবং ছাত্র-সংসদের মাথায় থাকবেন কলেজের অধ্যক্ষ। ছাত্রদের ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অধিকার দেওয়ার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি দায়বদ্ধতা দেখিয়েছে লিংডো কমিশনই। এনিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু রাজ্যের কৌশলটা অন্য। শাসকদল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে গোষ্ঠী কোন্দলের পরিস্থিতিটা। মধুভাণ্ডের লোভে সিপিএম আমল, কংগ্রেস আমল— দুই আমলের দুষ্কৃতীরাই তৃণমূল শিবিরে এবং এদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা শাসকদল ও রাজ্য সরকার কারোরই নেই। কলেজে কলেজে নৈরাজ্য ও সংঘর্ষ পরিস্থিতির সৃষ্টি এই কারণেই হয়েছে। এদের হাত থেকে রক্ষা পেতেই 'সেন্ট জেভিয়ার্স মডেল'কে ঢাল করা হয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্ব খুব ভালোভাবেই জানে রাজ্যে ক্ষমতায় তারা যতদিন রয়েছে, ততদিন কলেজে কলেজে ক্ষমতা কায়েম রাখা তাদের পক্ষে মোটেও কঠিন নয় এবং এর মধ্যে ছাত্র-সংসদ নাক না গলালেও চলবে। 'সেন্ট জেভিয়ার্স মডেলে' সবচেয়ে সমস্যার জায়গা হলো এটি একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এর শ্রেণীগত অবস্থান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি এক নয়।

দ্বিতীয়ত, এই সুবাদে এর ছাত্র-সংসদের মাথায় প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদাধিকারী বসতেই পারেন কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোয় তা কোনওভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য যদি সিপিএম মডেলে শিক্ষকদের দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগতের খেলায় তৃণমূল সরকার কোনো গেমপ্ল্যান করে থাকে সেটা অন্য কথা। এই ভাবেই বামফ্রন্ট সরকার ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক বিষিয়ে দিয়েছিল পরিকল্পনা মাফিক, সিপিএমের মেধাবিনী ছাত্রী এর পারদটা আরেকটু বাড়ালেন মাত্র।

ছাত্র-সংসদের নির্বাচন শুধু জল-কলের জন্য হয় না, ছাত্রদের দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে, সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতেও ছাত্রভোটের গুরুত্ব রয়েছে, অর্থাৎ ছাত্র-সংসদের আদর্শগত ভিত্তি অনস্বীকার্য। রাজ্যের শাসকদলের অবশ্য রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক কোনো আদর্শেরই বালাই নেই। ক্ষমতা কুক্ষিগত করাতেই তাদের মোক্ষ। সুতরাং 'সেন্ট জেভিয়ার্স মডেল'-এর আড়ালে ছাত্রসমাজকে নির্বীর্য করা, তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার প্রবেশকে ব্যাহত করা ও শাসকদলের তাঁবেদার করাই বর্তমান শাসক দলের একমাত্র লক্ষ্য।

''অবিরাম প্রার্থনা এবং অশ্রুতপূর্ব তপস্যা মিলিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে এমন এক গভীর ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, যাতে অহংবোধের লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস 'সমগ্রের' (পূর্ণ আদর্শের) এক সারসংক্ষেপ। আমাদের যে (ক্ষুদ্র) জীবনতরঙ্গ অনন্ত আত্মার চৈতন্যপ্রবাহে বিধৃত হয়ে সমুদ্রাভিমুখে ধাববান— তাঁর মতো মহান অতিচেতন সত্তাই কেবল সে তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারে। আমাদের পশ্চাতে এবং সম্মুখে যে শক্তি পরিব্যাপ্ত রয়েছে, তিনিই তার প্রমাণস্বরূপ।''

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে :
ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

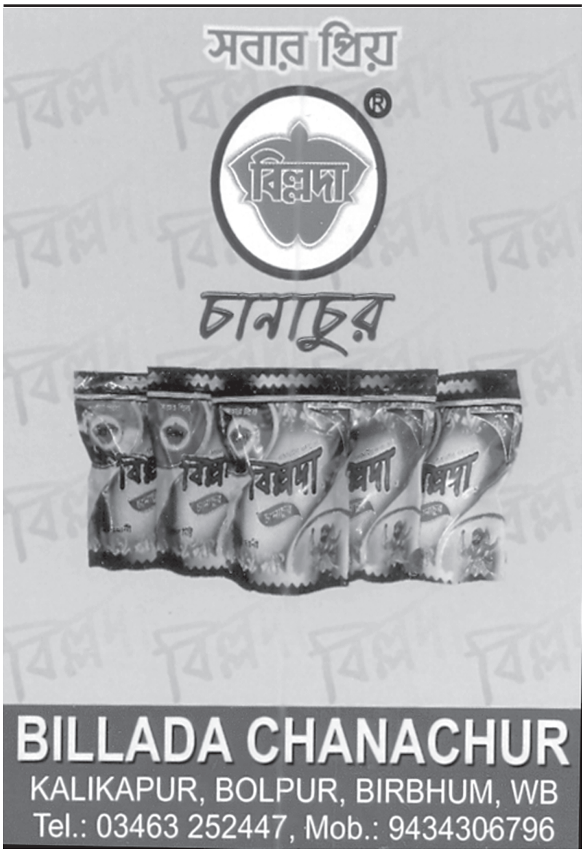

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

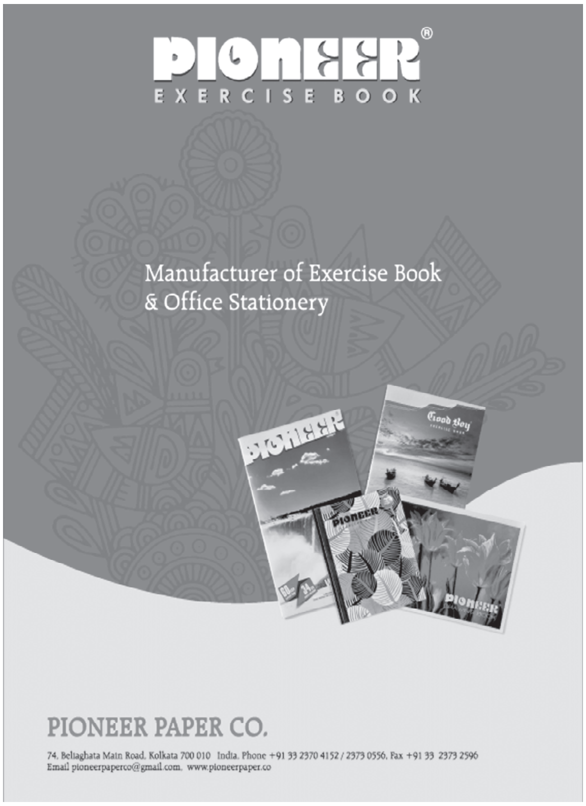

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে আনুগত্যের রাজনীতি

চন্দ্রভানু ঘোষাল

ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতির পদটি আলঙ্কারিক। অনেকটা ব্রিটেনের রাজা বা রানির মতো। শাসনযন্ত্রকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। মতামত দিতে পারেন কিন্তু সংসদের উভয়কক্ষে গৃহীত কোনও বিল বাতিল করতে পারেন না। অথচ স্বাধীনতার পর ভারতের প্রায় সব প্রধানমন্ত্রী তাদের বশংবদ কাউকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে চেয়েছেন। প্রায় কথাটা ব্যবহার করা হলো কারণ এই তালিকায় একমাত্র ব্যতিক্রম অটলবিহারী বাজপেয়ী। বাজপেয়ীর আমলে যিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন অর্থাৎ এপিজে আব্দুল কালাম ছিলেন দেশেবিদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। অটলবিহারী বাজপেয়ী বা ক্ষমতাসীন এনডিএ-র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন একথা অতি বড়ো নিন্দুকেও বলবে না। বস্তুত যখনই কোনও অ-রাজনৈতিক ব্যক্তি ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, বিধিবদ্ধ ভূমিকার বাইরে স্বতন্ত্র ছাপ রাখার চেষ্টা করেছেন। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এবং ড. আব্দুল কালাম— দু'জনের ক্ষেত্রেই কথাটা প্রযোজ্য। একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবত ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি হিন্দু কোড বিল বিতর্কে জওহরলাল নেহরুকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। সে কথায় আমরা পরে আসব। আগে দেখা যাক আনুগত্যের রাজনীতির প্রেক্ষাপটটি ঠিক কেমন।

১১ জুলাই, ১৯৬৯। এদিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চালচিত্রটাই বদলে গিয়েছিল। কংগ্রেস নেতা এস. নিজলিঙ্গাপ্পার পছন্দের প্রার্থী ছিলেন নীলম সঞ্জীব রেড্ডি। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জগজীবন রামের নাম প্রস্তাব করেন। শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভোটে জিতলেন নীলম সঞ্জীব রেড্ডি। নাটক শুরু হলো এরপর। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি ঘোষণা করলেন তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করবেন। উদ্বিগ্ন নিজলিঙ্গাপ্পা স্বতন্ত্র পার্টি এবং ভারতীয় জনসঙ্ঘের সমর্থন চাইলেন। সেবার ভারতীয় জনসঙ্ঘের পছন্দের প্রার্থী ছিলেন সি.ডি. দেশমুখ। নিজলিঙ্গাপ্পা

নেহরু এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ।

বললেন, স্বতন্ত্র পার্টি এবং ভারতীয় জনসঙ্ঘ তাদের 'দ্বিতীয় পছন্দের' ভোটটা যেন নীলম সঞ্জীব রেড্ডিকে দেয়। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে ইন্দিরা গান্ধী দলের সাংসদ বিধায়কদের বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী ভোট দেবার জন্য আহ্বান জানালেন। ভোটগণনার পর দেখা গেল, বেশিরভাগ দ্বিতীয় পছন্দের ভোট পেয়ে ভি ভি গিরি জিতেছেন। দ্বিতীয় স্থানে আছেন রেড্ডি আর তৃতীয় স্থানে দেশমুখ। কংগ্রেসের ভাঙনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ইন্দিরা গান্ধীর এই সিদ্ধান্ত।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা নেহাতই কথার কথা হয়ে থেকেছে কংগ্রেসি আমলে। এমনকী ইউপিএ-র আমলেও। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রথম রাষ্ট্রপতি হন ১৯৫০ সালে। মাত্র দু' বছরের জন্য। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর নাম প্রস্তাব করেন। পছন্দের লোক বলে নেহরু চেয়েছিলেন সি. রাজাগোপালাচারী রাষ্ট্রপতি হোন। কিন্তু বল্লভভাই প্যাটেল তাঁরই মতো কট্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম প্রস্তাব করে বসলেন। কংগ্রেসের সাংসদদের একটা বেশ বড়ো অংশ রাজাগোপালাচারীকে পছন্দ করতেন না। কারণ তিনি গান্ধীজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাজাগোপালাচারীর বিরোধী সাংসদদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। প্যাটেলের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোনওরকম পূর্বধারণা ছাড়াই নেহরু কংগ্রেস সাংসদদের কাছে রাজাগোপালাচারীর নামে সিলমোহর লাগাতে তৎপর হন। সেদিন নেহরুকে অপদস্থ হতে হয়েছিল বললেও কম বলা হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে তিনি নিজেই রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম সমর্থন করতে বাধ্য হন। ১৯৫০ সালে কোনও নির্বাচন হয়নি। রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রথম নির্বাচনের মুখোমুখি হলেন ১৯৫২-তে। বিরোধী প্রার্থী ছিলেন কে টি শাহ। রাজেন্দ্রপ্রসাদ পেয়েছিলেন ৫ লক্ষ ভোট। অন্যদিকে কে টি শাহ মাত্র ৯৩,০০০ ভোট।

বস্তুত একটি সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত নবীন

রাষ্ট্রের যে ধরনের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজন ভারতবর্ষ ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে তা খুঁজে পেয়েছিল। হিন্দু কোড বিলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিলে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। নেহরুকে লেখা একটি চিঠিতে (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১) ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছিলেন, 'My right to examine it (হিন্দু কোড বিল) on its merits, when it is passed by the Parliament, before giving assent to it is there. But if any action of mine at a later stage is likely to cause embarrassment to the government, I may take such appropriate action as I may be called upon to avoid such embarrassment consistently with the dictates of my own conscience...' এই চিঠি প্রমাণ করে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাষ্ট্রপতির পদটি নখদন্তহীন বাঘের সমতুল্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। কিংবা প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদকে না চটিয়ে বহালতবিয়তে রাজনৈতিক অবসরজীবন উপভোগের যে রেওয়াজ পরবর্তী রাষ্ট্রপতিরা চালু করেছেন তার থেকেও তিনি শতহস্ত দূরে ছিলেন। যাই হোক, হিন্দু কোড বিল বিতর্কে রাষ্ট্রপতির এই ভূমিকা নেহরু খুব ভালোভাবে নেননি। তিনি ব্রিটেনের রাজা-রানির উদাহরণ দিয়ে আলঙ্কারিক রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার এবং কর্তব্যের সীমাবদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। তার জবাবে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছিলেন, 'The more important question is that if English convention are to be imported... (they) should not be confined only to the manner in which the President should exercise his powers... There are a number of other convention which are equally well established in England which limit the powers of Parliament itself in the exercise of its legislative functions. I am referring to the Doctorine of Mandats.'

ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনও তাঁর আপোশহীন মনোভাবের জন্য সুপরিচিত। ১৯৫২ সালে রাধাকৃষ্ণন প্রথমে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের গর্ব যে রাধাকৃষ্ণনের মতো একজন শিক্ষক, গবেষক এবং বিশ্ববন্দিত দার্শনিক ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। একটি নবীন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে তিনি সারা বিশ্বকে আগ্রহী করে তুলতে পেরেছিলেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর নির্বাচনে সমগ্র বিশ্বের সুশীল সমাজে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন, 'ড. রাধাকৃষ্ণন ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, এটা দর্শন শাস্ত্রেরই সম্মান। একজন দার্শনিক হিসেবে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে। প্লেটো চাইতেন দার্শনিকরা দেশ শাসন করুন, ভারত যে কাজটা করে দেখাল তার জন্য তাকে আমার ধন্যবাদ।'

ইতিহাস অবশ্য বলবে রাধাকৃষ্ণন যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়টা খুব সহজ ছিল না। চীন ভারত আক্রমণ করেছিল এবং দেশের সদ্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি তাঁর সময়োপযোগী দায়িত্বও পালন করেছিলেন। যুদ্ধের বিপর্যয়ে আতঙ্কিত দেশবাসীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এক বেতার-বার্তায় বলেছিলেন, 'চীনা আক্রমণের ফলে আমাদের কিছু সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে এই ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। কোন ক্ষেত্রে উন্নতি করা দরকার এখন আমরা তা জানি। এও জানি, ভবিষ্যতে আমাদের উন্নতির অভিমুখ কোনদিকে হবে।' এরপর ১৯৬৫ সাল। এবার পাকিস্তান আক্রমণ করল। এবারও এক বেতার-বার্তায় (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫) রাধাকৃষ্ণন বললেন, 'পাকিস্তান ভেবেছে ভারত খুব দুর্বল কিংবা ওদের ভয়ে দিশেহারা অথবা সদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ভারত মোটেই কথায় কথায় যুদ্ধ বাধাতে চায় না। তবে আক্রান্ত হলে মুখের মতো জবাব দিতে জানে। পাকিস্তান চাইছে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটিয়ে ভারতকে কব্জা করতে। এর ফলে পাকিস্তানের বিপদই বাড়বে, ভারতের কিছুই হবে না।'

রাধাকৃষ্ণনের পর শুরু হলো দীর্ঘ এক অধ্যায় যা শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন দল এবং নেতাদের মন জুগিয়ে চলার ঐতিহ্য বহন করে। ১৯৬৭ সালে ভারতের প্রথম মুসলমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন জাকির হোসেন। সেবার কংগ্রেস লোকসভায় ২৮৩টি আসনে জয়লাভ করেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় তাদের পছন্দের প্রার্থী জাকির হোসেন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েছিলেন। জাকির হোসেন পেয়েছিলেন ৪.৭১ লক্ষ ভোট। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের প্রার্থী কোকা সুব্বারাও পেয়েছিলেন ৩.৬৪ লক্ষ ভোট।

১৯৭৪ সালে ভি. ভি. গিরির অবসর গ্রহণের পর ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ভারতের রাষ্ট্রপতি হন। ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী মানসিকতা তখন একটু একটু করে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় ইন্দিরার প্রয়োজন ছিল এমন একজন রাষ্ট্রপতির যিনি তার কাজের কোনও প্রতিবাদ তো করবেনই না, উপরন্তু সর্ব বিষয়ে জী-হুজুরি করবেন। ফকরুদ্দিন সাহেব সেই প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে সব থেকে বড়ো অভিযোগ, স্রেফ ইন্দিরাকে তুষ্ট রাখতে জরুরি অবস্থা জারির অর্ডিনান্সে তিনি চোখকান বুজে সই করেছিলেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে চাটুকারবৃত্তির এত বড়ো প্রমাণ সচরাচর মেলে না। পরবর্তীকালে ইন্দিরা এহেন পুতুল-রাষ্ট্রপতির খোঁজ পেয়েছিলেন জ্ঞানী জৈল সিংহের মধ্যে। জৈল সিংহ প্রকাশ্যে বলতেন, 'আমার নেতা (পড়ুন ইন্দিরা গান্ধী) যদি আমাকে ঝাড়ু বালতি নিয়ে রাস্তা সাফ করতে বলেন তাহলে আমি তাই করব।' একজন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দেশবাসী এই নির্লজ্জ চাটুকারিতা প্রত্যাশা করে কিনা পাঠক বিচার করবেন। একথা অনস্বীকার্য ভারতের সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে যুগান্তকারী কিছু করার ক্ষমতা দেয়নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দেশবিরোধী বা মানবতা বিরোধী কাজের সমালোচনাটুকুও করা যাবে না এরকম কোনও বিধিনিষেধও চাপিয়ে দেয়নি। পরবর্তীকালে দুই রাষ্ট্রপতি আর বেঙ্কটরমন (১৯৮৭-৯২) এবং শঙ্কর দয়াল শর্মার (১৯৯২-৯৭) মধ্যেও এই মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়।

অনেকদিন পর গা বাঁচিয়ে চলার মানসিকতা থেকে মুক্ত এক রাষ্ট্রপতির সন্ধান ভারতবর্ষ পেয়েছিল এপিজে আব্দুল কালামের (২০০২-২০০৭) মধ্যে। রাষ্ট্রপতি পদে

নির্বাচিত হবার আগেই আব্দুল কালাম ভারতের মিসাইল ম্যান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বস্তুত ভারতের ইনটিগ্রেটেড মিসাইল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম তাঁর হাতেই তৈরি। পোখরানে দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে তাঁর ভূমিকা ছিল একাধারে একজন রাজনীতিবিদের এবং বৈজ্ঞানিকের।

এপিজে আবদুল কালামকে মানুষের রাষ্ট্রপতি বলা হোত। এর আগে আর কোনও রাষ্ট্রপতি রাইসিনা হিলসের অভিজাত বলয় পেরিয়ে মানুষের এত কাছে যেতে পারেননি। সারা দেশের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন বরেণ্য শিক্ষক। বিভিন্ন সময়ে বলা তাঁর এক-একটি কথায় আজও সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী নেতা আফজল গুরুর মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা। ২০০১ সালে সংসদ ভবনে বোমা বিস্ফোরণের অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ২০০৪ সালে সর্বোচ্চ আদালত তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা

অটলবিহারী বাজপেয়ী ও এপিজে আবদুল কালাম।

শুধু সেই ফাঁক দিয়েই আফজল গুরু পালিয়ে যেত। তিনি যে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে তোষণবাদী রাজনীতির সমর্থক নন তার প্রমাণ ২০০৩ সালেও একবার পাওয়া গিয়েছিল। সেবার তিনি চণ্ডীগড়ে এক সমাবেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মতে, ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করা না গেলে প্রবল

রাজনৈতিক দল কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হলে এরা প্রায়শই ধরি মাছ না ছুঁই পানি-মার্কা অবস্থান নিয়ে থেকেছেন। একথা প্রণববাবু সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তিনি মোদী সরকারের জিএসটি নীতির সমর্থক। কারণ এতে বিতর্কের অবকাশ তেমন নেই। বিমুদ্রীকরণ নিয়ে প্রায় নীরব। আবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরোধী। কারণ তাতে ইসলামি মৌলবাদের

Chinese attack on both fronts

Forward posts fall in NEFA, Ladakh after stiff fight

NO MILITARY PLANES IN OPERATION: MENON

Express News Service

NEW DELHI Oct. 20

THE Indian posts of Dhola and Khinzemane, along the MacMahon Line, in the NEFA sector and two posts in the Chip Chap river valley area of the Ladakh western sector fell to the Chinese on Friday when they simultaneously launched a big offensive against the Indian forces

Moscow silent

Mystery over

Relations with China: official view in Delhi

Reference to U N not yet, says Menon

সংবাদপত্রে চীনা আক্রমণের খবর।

করে। যথারীতি আফজল গুরুর পরিবার প্রাণভিক্ষা চেয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করে। তারা সম্ভবত ভেবেছিল একজন মুসলমান রাষ্ট্রপতি আরেকজন মুসলমানের প্রাণভিক্ষার আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারবেন না। কিন্তু আবদুল কালাম সাড়া দেননি। আফজল গুরুর দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছিল। এই ঘটনায় দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। এক, আবদুল কালাম আগে ভারতীয় তারপর মুসলমান। দুই, দেশের একজন প্রতিভাধর বুদ্ধিজীবী হলেও তিনি চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী কমিউনিস্ট নন। যদি হতেন তাহলে

জনস্ফীতি রোধ করা কোনওদিনই সম্ভব হবে না। অর্থাৎ পরোক্ষে তিনি আঙুল তুলেছিলেন দেশের মুসলমানদের দিকে। ভারতের ইতিহাসে এই দৃষ্টান্ত শুধু অভিনব নয় ঐতিহাসিকও বটে।

ভারতের দুর্ভাগ্য আবদুল কালামের পরবর্তী দুই রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল এবং প্রণব মুখোপাধ্যায় আক্ষরিক অর্থেই আলঙ্কারিক প্রধান। এ এমন অলঙ্কার যা অলঙ্কৃত করে না! এরা কেউই তাদের রাজনৈতিক সত্তাকে বিসর্জন দিতে পারেননি। তাই নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধী কোনো

শেকড়ে ঘা লাগবে এবং কংগ্রেসি রাজনীতি ও শতাব্দীপ্রাচীন দলটির নাভিশ্বাস উঠে যাবে।

এই আনুগত্যের পটভূমিতে আগামী ১৭ জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। সরকার মনোনীত প্রার্থী রামনাথ কোবিন্দ এবং বিরোধীদের প্রার্থী মীরা নায়ার। যিনি জিতবেন তিনি ক্ষমতাসীন দল এবং প্রধানমন্ত্রীর অনুগত সেবকে পরিণত হবেন কিনা তা সময়ই বলবে। তবে এবারের নির্বাচনে যাঁর জেতার সম্ভাবনা বেশি সেই রামনাথ কোবিন্দ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ। তাই তার কাছে সবার আগে দেশ— এই মনোভাব আশা করাই যায়।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবন : ফিরে দেখা

ড. তুষার কান্তি ঘোষ

রাষ্ট্রপতি কে হবেন অর্থাৎ রাইসিনা হিলের প্রাসাদে কে প্রবেশ করবেন এই নিয়ে আজ ভারতবর্ষ তোলপাড় হচ্ছে। কে প্রবেশ করবেন সে দিকে না তাকিয়ে একবার রাষ্ট্রপতি ভবনটার দিকে ফিরে তাকানো যাক। কী আছে এই ভবনে? পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের শীর্ষ ব্যক্তির জন্য যে প্রাসাদ নির্দিষ্ট আছে তার আকৃতি বিশাল। পৃথিবীতে ভার্সাইয়ের রাজপ্রাসাদের পরেই হলো ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবন।

এই ভবন তৈরির ইতিহাসও বিচিত্র। ভারতের ভাইসরয় তখন হার্ডিঞ্জ সাহেব। একদিন তিনি শিকার করতে বের হয়েছেন। শিকার ক্ষেত্রের স্থানটি রাকবগঞ্জের কাছে। এই স্থানটি শিখদের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত, কারণ গুরু তেগবাহাদুরের মৃতদেহের অন্তিম সংস্কার এই স্থানের গুরুদ্বারেই হয়েছিল। বর্তমানে এই গুরুদ্বার রাষ্ট্রপতি ভবন ও পার্লামেন্টের কাছেই।

যা হোক, শিকার করার সময় হার্ডিঞ্জ একটি উঁচুস্থানে উঠে স্থানটির মনোরম রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এই স্থানেই তৈরি হবে ভাইসরয়ের নতুন প্রাসাদ। ভাইসরয়ের পূর্ব প্রাসাদটা ছিল বর্তমান দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। প্রাসাদ তৈরির কাজ শুরু হলো ১৯১৪ সালে। ১৫ বছর লেগেছিল এই প্রাসাদ তৈরি হতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলার জন্য প্রাসাদ নির্মাণের কাজ ধীর গতিতে চলেছিল। ১৯২১ সাল থেকে প্রাসাদ নির্মাণের কাজে গতি এল। প্রাসাদ সম্পূর্ণ হলো ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে।

ভাইসরয়ের এই প্রাসাদটি নির্মিত হলো গথিক ও ভারতীয় শিল্পরীতির মিশ্রণে। এই প্রাসাদের স্তম্ভগুলো হলো ভারতীয় ভাস্কর্যের আদলে আর শীর্ষ গম্বুজ হলো ইউরোপীয় আদলে। এই প্রাসাদ তৈরি করার জন্য প্রস্তরখণ্ড আনা হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন দেশগুলো হতে। ভারতীয় প্রজাদের দ্বারা ইংরেজদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ‘স্টার অব ইন্ডিয়া’র একটি রেপ্লিকা আজও রয়েছে এই ভবনের প্রান্তরে।

এই প্রাসাদের মূল ভবনটা দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ একর জমির উপরে। মাঝে আছে গম্বুজ। এই ভবনে ৩৪০টা ঘর এবং দেড় মাইল জুড়ে আছে এর করিডর। গম্বুজের উচ্চতা ১৮০ ফুট। এর বামস্কন্ধকে বলে ‘সাউথ কোর্ট’ আর দক্ষিণ স্কন্ধকে বলে ‘লেফট্ কোর্ট’। সাউথ কোর্টের দিকে আছে অতিথি আবাস এবং ভারত সরকারের কয়েকটি বিভাগের কার্যালয়। নর্থ কোর্টে আছে রাষ্ট্রপতির বাসগৃহ এবং তাঁর ব্যক্তিগত কর্মীদের আবাসস্থল। গম্বুজের নীচের কক্ষ ‘দরবার হল’ বলে পরিচিত। তারই পাশে অশোকা হল ও ‘ব্যাঙ্কোয়েট হল’। অশোকা হল আগে বলরুম বা নাচঘর বলেই খ্যাত ছিল। এই বলরুমের আয়তন ৬৮' × ৬৩'। এই নৃত্য কক্ষে কবি নিয়াজীর ছোট স্তবক অনুযায়ী মুরালের নির্মিতিতে পূর্ণ। মুরালগুলি পারস্য ও বৌদ্ধ শিল্পের অপূর্ব সংমিশ্রণে প্রস্তুত করেছিলেন একজন ইতালিয় শিল্পী। ব্যাঙ্কোয়েট হলের আয়তন ১০৪' × ৩২'। এই হল ঘরে অপূর্ব সব কাঠের ফ্রেমে ভাইসরয়দের বড় বড় ছবি শাসন কাল অনুসারে সাজানো। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদেরও বড় ছবি এঁকেছিলেন বীরেন দে আর ড. রাধাকৃষ্ণনের ছবি এঁকেছিলেন নিকোলাস রিখ।

ভাইসরয়ের ছবি টাঙানো নিয়ে একটি ঘটনা আছে। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নিকিতা ক্রুশ্চেভ ছবিগুলো দেখে নেহরুকে প্রশ্ন করেছিলেন--- ‘ব্রিটিশ ভাইসরয়দের এই সব ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন কেন যা আপনাদের দাসত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়?’ নেহরু উত্তর দিয়েছিলেন, ‘এই ছবিগুলো সরিয়ে দিয়ে আপনি তো আর ইতিহাস মুছে দিতে পারেন না।’

ভাইসরয়ের প্রাসাদ তৈরি করতে খরচ হয়েছিল সেদিনের হিসেব অনুযায়ী ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। উপাদান হিসেবে লেগেছিল ৭৬০০ টন সিমেন্ট, ১৪০০ টন ইস্পাত।

এই ভবনের পিছনেই আছে মুঘল ‘গার্ডেন’ প্রায় সাড়ে পনেরো একর জমির উপর। তারপরেই ‘সার্কুলার গার্ডেন’ ও পুর্দ্দা গার্ডেনে’র অবস্থান। এই বাগানগুলোর পরিকল্পনা করেছিলেন স্যার এডউইন লাতয়েন। এই বাগানগুলোর পূর্ণ সৌন্দর্য বিকশিত হয় ফেব্রুয়ারিতে।

পারস্যের দামি দামি গালিচা পাতা ছিল ভবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা কাহিনিগুলো যেন জড়িয়ে আছে এখানে। দরবার হলেই ভাইসরয়েরা শপথ নিতেন। এমনকী ভারত স্বাধীন হওয়ার পর মাউন্টব্যাটেন স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল রূপে দরবার হলেই শপথ নিয়েছিলেন।

পরাধীন ভারতে ভাইসরয়ের এই প্রাসাদে সর্বপ্রথম যে ভারতীয় প্রবেশ করেছিলেন তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯৪৭-এর এপ্রিলের কোনো একদিনে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে প্রাতঃরাশের জন্য। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রোটোকল অনুসারে আর কোনো ভারতীয় স্বাধীনতার আগে এই প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারেনি।

যেদিন ভারত স্বাধীন হলো সেই রাত্রে এই প্রাসাদের একটি ঘটনা ছিল স্মরণীয়। নেহরু গদগদ স্বরে মাউন্ট ব্যাটেনকে বলেন, **“Please honour us by being the first governor general,”** মাউন্ট ব্যাটেন নেহরুর সঙ্গে উষ্ণভাবে করমর্দন করে বললেন, **“It would be an honour for me and with the help of God I will carry out the duties to the best of my abilities.”** রাজেন্দ্র প্রসাদ পাশেই ছিলেন। তখন তিনি গণপরিষদের সভাপতি। নেহরু এবার একটা খাম তুলে দিলেন মাউন্টব্যাটেনের হাতে, তাতে মন্ত্রীদের নামের তালিকা ছিল যাঁরা সেই সময় শপথ গ্রহণ করবেন। মাউন্টব্যাটেন খামটা খুলে দেখলেন একটি সাদা কাগজ। কোনো নামের তালিকা নেই। যাহোক দ্রুত ত্রুটি সংশোধিত হলো। কিন্তু এই মজার ঘটনাটা রাজেন্দ্রপ্রসাদই প্রকাশ করেছিলেন।

এই ভবনের অতিথি আবাসটি তিনতলা। প্রতিটি তলায় সাতটি করে ‘বেডরুম স্যুট’। ‘দ্বারকা স্যুট’ বিদেশি প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। নীচে ‘মর্নিং রুম’, ‘প্যানেল রুম’ এবং ‘ড্রইং রুম’। ড্রইং রুমের রং হলুদ। এখানে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন জনের দেখা করেন। এই ঘরে সোনার রেকর্ডে গান্ধীজীর কণ্ঠস্বর ধরে রাখা আছে। করেছিলেন কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিংয়ের কর্মীরা। এখানে ইংল্যান্ড ও ইটালির শিল্পীদের আঁকা ছবি আছে। এই প্রাসাদের পাশে গল্ফ খেলার মাঠ ছিল ২৭৫ একর জমি জুড়ে। পরে এখানে চাষ হতো। আছে নার্সারি ও ক্রিকেট খেলার মাঠ। দরবার হলে আছে বুদ্ধমূর্তি। তার বাইরে দ্বারের কাছে আছে নন্দী বিগ্রহ ও জয়পুরী স্তম্ভ।

মাউন্টব্যাটেনের সময় লেডি মাউন্টব্যাটেলের ইচ্ছায় প্রাসাদ জুড়ে দামি ভেলভেটের পর্দা, ফ্রান্স থেকে আনা সিল্ক ও বিভিন্ন সুদৃশ্য বস্ত্রের সাজসজ্জা ছিল। ছিল সারা পৃথিবী থেকে সংগৃহীত সজ্জার উপকরণ। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশ করার পর এই বিদেশি সাজসজ্জা সরিয়ে ফেলা হলো। সর্বত্রই টাঙানো হলো খাদির পর্দা। খাদি ও তাঁতবস্ত্রের আচ্ছাদন। খাদির পর্দা ও আস্তরণ পরিষ্কার করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। রাজেন্দ্রপ্রসাদের জীবন ছিল সহজ সরল আটপৌরে। তাই না ছিল তাঁর এই সাজসজ্জার প্রতি আকর্ষণ, না ছিল খাদ্যদ্রব্যের সুস্বাদু পদের প্রতি মোহ। সকল সৌন্দর্যের উপর বৈরাগ্যের তাম্র ধূসরতার এক আস্তরণ জমা হতে লাগল এই সময়।

ড. রাধাকৃষ্ণনের সময়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের হাল ফেরালেন তাঁরই পুত্রবধূ শ্রীমতী এস. গোপাল। শ্রীমতী গোপালের রুচিতে আভিজাত্য ছিল। ধুলোয় ভরা খাদির সব উপকরণের বিদায় ঘটল। পুনরায় ফিরে এল দামি দামি রেশমবস্ত্র ও ভেলভেটের আচ্ছাদন। তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের আধুনিক ধারার সাজসজ্জায় সমৃদ্ধ করলেন রাষ্ট্রপতি ভবনকে। ড. রাধাকৃষ্ণন নিজে রাষ্ট্রপতি ভবন ঘুরে ঘুরে দেখতেন। কর্মীদের সঙ্গে মিশতেন, সমস্যার কথা আলোচনা করতেন।

কতদিন পার হয়ে গেছে তারপর। কত রাষ্ট্রপতি এসেছেন, আবার চলে গেছেন। সেদিনের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজত্বের গর্বের আর ক্ষমতার প্রতীক ছিল যে প্রাসাদ— আজ তারই নাম রাষ্ট্রপতি ভবন। গণতান্ত্রিক দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এই প্রাসাদ রূপকথার কাহিনির মতো। এর থেকে শত শত যোজন দূরে তাদের মানসিক অবস্থান। যাঁরা রাষ্ট্রপতির মর্যাদা নিয়ে এই প্রাসাদে প্রবেশ করেন তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে নিত্য সম্পর্কের পরিধি থেকে পাঁচ বছরের জন্য হারিয়ে যান এই প্রাসাদের মোহময় প্রোটোকলে আবদ্ধ হয়ে। যে-কোনো শাসন ব্যবস্থায়— তা ব্রিটিশের স্বৈরতন্ত্রী হোক কিংবা স্বদেশি গণতন্ত্র হোক— সাধারণ মানুষের কাছে এই ভবন কল্পলোকের প্রাসাদের মতো।

মোগল গার্ডেন।

এই সময়

ঝাঁপ

অনলাইনে প্যারাসুট কিনেছিলেন ব্রাজিলের এক ব্যক্তি। সম্ভবত সেটা কাজ করে কিনা

দেখার জন্যই বহুতলের বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। যদিও প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। ভাগ্য ভালো ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়নি। ভদ্রলোক নির্বিঘ্নে অনেকটা উড়ে মাটিতে পা রাখেন।

চীনে বিপত্তি

কিনবেন বলে দোকানে ব্রেসলেট দেখছিলেন চীনের এক মহিলা। হঠাৎই একটি ব্রেসলেট

ভেঙে যায়। আর ঠিক তখনই তার চোখে পড়ে নোটিশটি। যেখানে লেখা আছে, জিনিস ভাঙলে তার দাম ক্রেতাকে দিতে হবে। ভাঙা ব্রেসলেটটির দাম ৪৪,১১০ ডলার শুনে অজ্ঞান হয়ে যান মহিলা। আপাতত তিনি হাসপাতালে।

পুলিশকে চড়

ট্রাফিক নিয়ম না মেনে গাড়ি চালানোর জন্য হিমাংশু মিত্তালকে গ্রেপ্তার করেছিলেন পঞ্জাব পুলিশের এক কনস্টেবল। পুলিশের স্পর্ধা দেখে তাকে সটান চড় কষিয়ে দেন হিমাংশু। এক পথচারীর ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ঘটনাটি।

সমাবেশ -সমাচার

ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে কলকাতায় আন্তর্জাতিক যোগদিবস উদ্‌যাপন

গত ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগদিবসে পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে কলকাতার রানি রাসমণি রোডে যোগদিবস পালিত হয়। কলকাতার বিভিন্ন এলাকা

থেকে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক যোগদিবস উদ্‌যাপন সমিতির পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু, বিশিষ্ট পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস, ক্রীড়াবিদ বিশ্বজিৎ পালিত, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল শিবনাথ মুখার্জী, প্রভোদয় চৌধুরী এবং তপন মোহন চক্রবর্তী মঞ্চে ছিলেন। সকাল ৭ টায় রাজ্যপাল-সহ কার্যকর্তারা মঞ্চে আসন গ্রহণ করার পরই শুরু হয় বিশিষ্ট যোগশিক্ষক আশিস পালের নির্দেশনায় যোগ প্রদর্শন। প্রায় দু' হাজার মানুষ সূর্যনমস্কার-সহ বেশ কয়েকটি যোগাসন করেন। ড. জিষ্ণু বসু যোগদিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রশিক্ষণ বর্গ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় যোজনানুসারে উত্তরবঙ্গের প্রাদেশিক কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ শিলিগুড়ি জেলার শালবাড়ি প্রখণ্ডের বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। বর্গ

১০ থেকে ২০ জুন পর্যন্ত চলে। বর্গে ৭০ জন শিক্ষার্থী ২৫ জন শিক্ষক-প্রবন্ধক-সহ ৯৫ জন উপস্থিত ছিলেন। পুরুষ ৭৫ জন, মহিলা ২০ জন। বর্গ উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা ধর্মনারায়ণ শর্মা ও প্রাদেশিক সম্পাদক উদয়শঙ্কর সরকার। বর্গাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রকাশ চক্রবর্তী। কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বালকৃষ্ণ নাইক, ক্ষেত্রীয় প্রভারী সুধাংশু পট্টনায়ক, কেন্দ্রীয় সৎসঙ্গ প্রমুখ বসন্ত রথ শিক্ষার্থীদের পথনির্দেশ

এই সময়

খ্যাতির জন্য

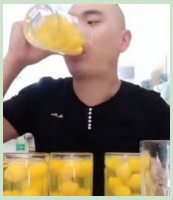

ইন্টারনেটে বিখ্যাত হবার শখ! তাই চীনের এই ব্যক্তি ১৭ সেকেন্ডে ৫০টি কাঁচা ডিম খেয়েছেন! সোশ্যাল মিডিয়ায় লক্ষাধিক মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন এই দানবিক কীর্তি। কিন্তু প্রশংসার বদলে যা জুটেছে তা লেখার যোগ্য নয়।

অসমে সূর্যোদয়

গ্রামে-গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চান তাই অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল রাজ্যে

সৌরশক্তি চালিত বৈদ্যুতিকরণের পরিকাঠামো নির্মাণে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অসমে অনেকেই সৌরশক্তি নির্মাণ প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চান বলে তিনি জানিয়েছেন।

অরুণাচলে সুলভ

অরুণাচল প্রদেশের প্রত্যেক বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচালয় গড়ে তোলা হবে। এই

কাজে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করবে সুলভ ইন্টারন্যাশনাল। জিরো ভ্যালির হং গ্রামে এই প্রকল্পের কাজ প্রথম শুরু হবে।

দান করেন।

ক্ষেত্রীয় ও প্রাদেশিক কার্যকর্তা ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্র প্রচারক প্রমুখ রমাপদ পাল, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক জলধর মাহাতো, বিভাগ প্রচারক গণেশ পাল, অমিয় সরকার উপস্থিত থেকে বৌদ্ধিক প্রদান করেন। বর্গ পরিচালনা করেন প্রান্তীয় সংগঠন সম্পাদক গৌতম সরকার বর্গে সর্বব্যবস্থা প্রমুখ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি জেলা সভাপতি মঙ্গলময় মুখার্জী।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ২১ থেকে ৪ জুন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি দক্ষিণবঙ্গ সম্ভাগের 'প্রবেশ (প্রথমবর্ষ) শিক্ষাবর্গ' হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাখরাহাট সাঁজুয়া অঞ্চলের ফিউচার জেমস্ অ্যাকাডেমি স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। পনেরো দিন ব্যাপী এই শিক্ষা বর্গ দক্ষিণবঙ্গের ১৩টি

জেলার মধ্যে পুরুলিয়া বাদে ১২টি জেলা থেকে মোট ৮০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ২০ জন ছিলেন গৃহিণী। শিক্ষা বর্গে বাংলার ৬ জন শিক্ষিকা ছাড়াও ক্যারাটেতে ব্ল্যাকবেল্ট প্রাপ্ত বিশেষ শিক্ষিকার দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বৌদ্ধিক বিষয়ে সমিতির কার্যকর্ত্রী ছাড়াও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশবিদ মোহিত রায়, সমাজসেবী শক্তিশেখর দাস, ড. রমা ব্যানার্জী এবং নীলাঞ্জনা রায়। সমিতির অখিল ভারতীয় সহ সম্পর্ক প্রমুখ কে. সীতাআক্কাজী বর্গের শেষ সাতদিন উপস্থিত ছিলেন। ৩ জুন শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঘোষসহ বাখরাহাট অঞ্চলে পথসঞ্চলন হয়। ৪ জুন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতাতাই হলদেকর এবং পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহিকা মহুয়া ধর।

গত ১ থেকে ১৬ জুন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ বর্গ উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ-স্থিত সারদা বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন রায়গঞ্জ টেন ক্লাস (হায়ার সেকেন্ডারি) বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী প্রতিমা দাস। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রচারিকা শ্রীমতী নয়না রানি। প্রথম বর্ষে ৯৪ জন এবং দ্বিতীয় বর্ষে ১৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। মোট ৮ জন শিক্ষিকার দ্বারা এই বর্গটি পরিচালিত হয়। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রের দু'জন, অন্ধ্রপ্রদেশের একজন এবং পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ জন শিক্ষিকা ছিলেন। কার্যকর্ত্রী এবং প্রবন্ধিকার সংখ্যা ৩০ জন। বিদ্যামন্দিরের আচার্যারাও বর্গে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সঞ্চালিকা শ্রীমতী মুক্তিপ্রদা সরকার ও প্রান্ত কার্যবাহিকা শ্রীমতী ঋতা চক্রবর্তী। কেন্দ্রীয় অধিকারীদের মধ্যে বর্গে উপস্থিত ছিলেন সমিতির অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতাতাই হলদেকর এবং সহ-কার্যবাহিকা রেখা রাজে। ১৪ জুন ঘোষবাদ্য- সহযোগে পথ সঞ্চলন হয়। ১৬ জুন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইটাহার বিএড কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সংঘমিত্রা ঘোষ। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীমতী রেখা রাজে।

এই সময়

তাইওয়ানে আমেরিকা

তাইওয়ানকে ১.৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রি করতে চলেছে আমেরিকা।

অ্যান্টি-র‍্যাডিয়েশন মিসাইল এবং এম এস-২ সিরিজের মিসাইল-সহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে তালিকায়। চীন এর প্রতিবাদ করলেও আমেরিকা গুরুত্ব দিতে নারাজ।

নীতীশের নিন্দা

শিশু বয়েসে বিয়ের ফলে মেয়েদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। মেয়েদের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই

প্রথা সর্বতোভাবে নিন্দাজনক। বিহারে ক্রমবর্ধমান শিশুবিবাহের বিরুদ্ধে সম্প্রতি এই ভাষায় রুখে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশকুমার।

টাকা থেকে রোগ

আজকাল অনেকেই জানেন ফোনে, বাস-ট্রামের সিটে দরজার হাতলে নানারকম রোগের জীবাণু বসবাস করে। সম্প্রতি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজিস্ট জেন

কার্লটন জানিয়েছেন ব্যাঙ্ক নোট থেকেও চর্মরোগের নানা জীবাণু ছড়ায়। সুতরাং সাধু সাবধান!

সমাবেশ -সমাচার

হাওড়ার তাজপুরে যোগদিবস

পতঞ্জলি যোগ সমিতি, হরিদ্বার পরিচালিত শ্যামাপ্রসাদ ইন্সটিটিউট অব কালচার, তাজপুর, হাওড়ার উদ্যোগে প্রসাদস্মৃতি সরস্বতী শিশুমন্দিরে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলীর উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে প্রাণায়াম শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে

যোগ প্রাণায়াম প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যোগশিক্ষক তপন রীত ও স্বপন মান্না। সকলেই অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যোগ অনুশীলন করেন।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের কার্যকর্তা অভ্যাসবর্গ

গত ২৫ ও ২৬ জুন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঠেঙ্গাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে গৌড়বঙ্গ বিভাগের (মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর) কার্যকর্তা অভ্যাসবর্গের আয়োজন করে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ। বর্গে গৌড়বঙ্গ বিভাগের ৮০ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। বর্গে উপস্থিত থেকে পথনির্দেশ করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল, রাজ্য সম্পাদক অরূপ সেনগুপ্ত, সংরক্ষক অলোক কুমার দাস ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সত্যনারায়ণ মজুমদার। বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন কুনোর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ মহারাজ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বাপী মিশ্র এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী। বর্গের উদ্বোধনী ভাষণে সত্যনারায়ণ মজুমদার অভ্যাসবর্গ ও সম্মেলনের পার্থক্যের উল্লেখ করে অভ্যাসবর্গের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রমের প্রথম সত্রের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল দৈনন্দিন জীবনে ভারতীয় যোগের গুরুত্ব। এ বিষয়ে আলোকপাত করেন সংগঠনের অন্যতম সদস্য রক্ষাকর রাণো। দ্বিতীয় সত্রে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল তাঁর মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষায় শাশ্বত মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেন। কুনোর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ মহারাজ তাঁর আশীর্বচনের মাধ্যমে শিক্ষকদের সমৃদ্ধ করেন। দ্বিতীয় দিনের বিশেষ আলোচনায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাপী মিশ্র তাঁর আলোচনায় ভারতীয় শিক্ষাদর্শনের তাত্ত্বিক দিক অপেক্ষা ব্যবহারিক দিকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। অভ্যাসবর্গ পরিচালনা করেন শিক্ষক শুভেন্দু বকসী।

পরিবার প্রবোধনের সংবর্ধনা সভা

গত ২১ জুন পুণ্য রথযাত্রার দিন পরিবার প্রবোধনের পক্ষ থেকে কালনায় ৯২ বছর বয়স্ক প্রবীণ কার্যকর্তা তারকনাথ কবিরাজকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন পরিবার প্রবোধন প্রমুখ অমর কৃষ্ণ ভদ্র, বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারীর কালনা শাখার সংযোজক চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি, সমর ঘোষ প্রমুখ।

আমলাতন্ত্রকে ভারতের পরিবর্তনের বাহক হতে হবে

অতিথি কলম

এল সি গোয়েল

সুশাসন লাগু করতে গেলে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পড়ে। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি প্রশাসনে নিযুক্ত আমলারা এই পরিবর্তনের অনুঘটক বা এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এখন একটি শক্তিশালী ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম প্রশাসনও রয়েছে। এরা নীতি নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপায়ণের বিষয়েও তৎপর। নতুন ভারত গড়ার বিষয়টাই এখন স্বাভাবিক বিষয়। এই সরকারের অগ্রাধিকারে রয়েছে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব করে তোলার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণ যাতে গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাঁদের দীর্ঘদিনের প্রাপ্যটুকু পেতে পারেন। একই সঙ্গে সমাজে যেন সমতা ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্ধারিত উন্নয়নের অভিমুখকে বাস্তবায়িত করতে হলে দেশের আমলা বাহিনীকেও নিজেদেরকে ঘসামাজা করে নিতে হবে। 'চলতা হ্যায়'-এর স্থিতাবস্থার অচলায়তনের বাইরে এসে তাদের নিজেদের ভূমিকাকে 'প্রোড্যাকটিভ' করতে হবে।

বস্তুত, আমলাদের কেবলমাত্র নির্দিষ্ট দায়িত্বের আধিকারিক হিসেবে কাজ না করে দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ও তাদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই নিজেদের নিয়োজিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তাদের কোনো ওজর আপত্তি কিন্তু গ্রাহ্য হবে না। অন্যদিকে যে সমস্ত আধিকারিক জনগণের হিতকারী হয়ে যৌথ জনগোষ্ঠীর উপকারে লাগতে পারে এমন উদ্দেশ্যে কোনও সদর্থক সিদ্ধান্ত নেন তখন তাঁদের বিরুদ্ধে যে কোনও মিথ্যে অভিযোগ এলে সেগুলি উড়িয়ে দিতে হবে। সরাসরি সেই আধিকারিকদের পেছনে সরকারকে দাঁড়াতে হবে। মিথ্যে অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে দুম করে কোনও তদন্ত কমিশন বসিয়ে দিলে চলবে না।

২০১৩ সালে মন্ত্রীমণ্ডলের সচিবদের দপ্তরে (Cabinet Secretariat) কর্মরত থাকাকালীন স্পেশ্যাল সেক্রেটারি হিসেবে আমি ও কিছু দপ্তর সহকর্মী একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলাম— যে বেনামা বা উটকো কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত হবে না। ডিপার্টমেন্ট অব পার্সোনাল ও ট্রেনিং (ডিওপিটি)-এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে Provention of Corruption Act-এ আমরা misconduct ও Criminal misconduct-এর মধ্যে নির্দিষ্ট পার্থক্য তৈরি করার উদ্দেশ্যে আইনে বদল আনার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এর মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদেরও আমরা আইনের আওতায় আনতে চেয়েছিলাম যাতে কর্মরত থাকাকালীন কোনও সদর্থক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিণতিতে তাঁরা অবসরপ্রাপ্ত অবস্থায় হেনস্থা না হন।

এই পরিমার্জন এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু সৎ ও নিষ্ঠাবান অফিসারদের দিয়ে কাজ করাতে গেলে এই আইনের লাগু হওয়া আশু প্রয়োজন। একই সঙ্গে পাবলিক সার্ভেন্টদের কাজের দায়বদ্ধতাকে আরও কঠোর ভাবে বিচার করা বিশেষ দরকার। বাজারে প্রায়ই শোনা যায় সরকারি আধিকারিকরা তাদের নির্দিষ্ট কাজ বা দায়িত্ব পালন না করলেও কখনই কোনো শাস্তি ভোগ করেন না। সদাই পার পেয়ে যান। মোদ্দা কথায় নিকম্মারা কখনই শাস্তির মুখে পড়েন না। কিন্তু এ কথাটা বলা প্রয়োজন বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্বশীল বহু আধিকারিক রয়েছেন যাঁরা নীরবে পেশাগত দক্ষতায় তাঁদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

মোদী সরকার যে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে কর্মরতদের ক্ষেত্রেও দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি

> "আবার বলছি, নতুন ভারতের কল্পনাকে সাকার করতে সরকারি কর্মীদেরও যে গভীর দায়বদ্ধতা রয়েছে তাদের সেটি বিস্মৃত হলে চলবে না। তাদেরও অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজে হাত লাগিয়ে 'চালতা হ্যায়' (status qus) এর মানসিকতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। তবেই এক শক্তিশালী ভারত বিশ্বে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের পথে অগ্রবর্তী হবে।"

যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছেন অর্থাৎ ক্ষমতাবানদেরও ব্যর্থতার জন্য কৈফিয়ত তলব করা হবে এটা খুবই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। জয়েন্ট সেক্রেটারি স্তরের নীচেও এই পদক্ষেপ জারি করতে হবে। কেননা সরকারের সিদ্ধান্তগুলির গরিষ্ঠাংশের খসড়াই তৈরি হয় ডাইরেক্টর বা আন্ডার সেক্রেটারি স্তরের আমলাদের মাধ্যমে। ইন্টিগ্রেটেড ফাইনান্স ডিভিশন (আই এফ ডি) যার মাথায় রয়েছেন একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি বা অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি স্তরের আধিকারিক যিনি অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। তাঁকেও 'নতুন ভারতের' ভাবনাকে, পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে আরও বেশি পজিটিভ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সাপেক্ষে নমনীয় হতে হবে। দেশের উন্নয়নের সামগ্রিক চিত্রটা তাদের মাথায় থাকা দরকার। বাস্তবে আইএফডি দপ্তরের একটি বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন দরকার, যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া ও টাকা দেওয়া যায় (রিলিজ অফ ফান্ড)। ভারতের মতো দেশ যে আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে উঠে আসতে বদ্ধপরিকর সেখানে আই এফ ডি দপ্তরের আমলাদের ভাবনা স্তরে আমূল পরিবর্তন দরকার। তবেই তাঁরা সরকারের পরিকল্পনার সঙ্গে তাল মেলাতে পারবেন। সিভিল সার্ভিসের প্রবীণ আধিকারিকদেরও ভাবনা চিন্তায় প্রাগৈতিহাসিক মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি।

এখানে বলা বিশেষ জরুরি যে দায়বদ্ধতা বা কৈফিয়ত তলব অর্থে ভুল করলে খেসারত দেওয়ার বিষটি আমলাতন্ত্রের সর্বনিম্ন স্তরেও বলবৎ করা আরও বেশি প্রয়োজন বিশেষ করে রাজ্য স্তরে ও আরও নীচে। কেননা সাধারণ নাগরিকরা বেশিরভাগ সময় এঁদেরই সংস্পর্শে আসেন। এটাই এখন দস্তুর যে এঁদের থেকে কাজ পেতে গেলে নজরানা লাগে। এরই পোশাকি নাম দুর্নীতি। তথ্যপ্রযুক্তির আরও বেশি প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের প্রয়োজনীয় কাজগুলি (পণ্য ও পরিষেবা) যথা রাজ্যস্তরে মিউনিসিপ্যাল মিউটেশন, জলের লাইন, লাইসেন্স ইত্যাদি যত বেশি অনলাইনে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমায় করা যাবে ততই দায়বদ্ধতাকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা যাবে। কেননা দায়বদ্ধতা তখনই নিশ্চিত হবে যখন নির্দিষ্ট সময়সীমায় কাজ না করতে পারলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে জরিমানা দিতে হবে।

২০১৪ সালে এই সরকার ক্ষমতায় আসার সময় যে কথাটি প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন যে 'মিনিমাম গভর্নমেন্ট ম্যাক্সিমাম গভর্ননেন্স' সেটিই সুশাসনের অন্যতম মাপকাঠি। ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সরকারি আইন কানুন, নিয়মবিধি বা সরকারের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রগুলির সরলীকরণ ও দ্রুততা। কারবারীরা যেন নিয়ম কানুন পদ্ধতিগুলি সহজে বুঝতে পারে, এমন কিছু না থাকে যা উদ্যোগপতিদের কাজে অনাবশ্যক দেরি করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে ভীষণ প্রয়োজন প্রযুক্তির প্রয়োগ — তা কী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের প্রশ্নে কী আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রশ্নে। কেন্দ্রীয় স্তরে ও কিছু রাজ্যে এই দিশায় এখন কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু বহু কাজ বাকি আছে। এই বিপুল কর্মোদ্যোগের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে সিনিয়র আধিকারিকদের ওপর। তাদের দিক থেকেই বাড়তি উদ্যোগ ও আন্তরিকতা দেখাতে হবে। সরকারি স্তরের কাজের পদ্ধতি ও রীতির ক্ষেত্রে ক্রমাগত সরলীকরণ ছাড়াও সরকারি কর্মীস্তরেও যথাযথ মূল্যায়ন করে তাদের সঠিক সংখ্যা স্থির করাও একটি বিশেষ দিক। সরকারি মন্ত্রীদের সংখ্যা কমলেই দপ্তরও কমবে আর যত দপ্তর কমবে ততই প্রশাসনে কর্মদক্ষতা বাড়াতে সুবিধে হবে। সেই লক্ষ্যে বেশ কিছু একই পরম্পরার দপ্তর বা বিভাগকে এক সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া সুফল দিতে পারে। নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য অনেকগুলি দপ্তরের (হয়ত যেগুলি তেমন দরকারই হোত না) অনুমোদন হয়ত আর প্রয়োজন হবে না। এ যাবৎ হয়তো এমনই অনেক সমগুরুত্বের দপ্তরে কোনো প্রকল্প চরম স্তরে পৌঁছেও আটকে গেছে। এক্ষেত্রে সরকারের খরচেও সাশ্রয় হতে পারে কেননা অনেকগুলি সেক্রেটারি স্তরের পদেরও দপ্তর বিলয়ের সঙ্গে অবলুপ্তি ঘটবে।

আবার বলছি, নতুন ভারতের কল্পনাকে সাকার করতে সরকারি কর্মীদেরও যে গভীর দায়বদ্ধতা রয়েছে তাদের সেটি বিস্মৃত হলে চলবে না। তাদেরও অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজে হাত লাগিয়ে 'চালতা হ্যায়' (status qus) -এর মানসিকতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। তবেই এক শক্তিশালী ভারত বিশ্বে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একাসনে বসবার পথে অগ্রবর্তী হবে।

(লেখক চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ ইণ্ডিয়া ট্রেড প্রমোশন অর্গানাইজেশন)

চিঠিপত্র

অসমে বিদেশি সনাক্তকরণ : অমানবিক প্রক্রিয়া

সত্তর বছর পূর্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশভাগের বলি হয়ে আসা ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা এখনও অসমে বুঝে উঠতে পারছেন না স্বাধীনতা শব্দের প্রকৃত অর্থ কী! তাদের মনে শুধু এই শব্দগুলিই ঘুরপাক খাচ্ছে--- অসমচুক্তি, ডি-ভোটার, ডিটেন্‌শন ক্যাম্প, বিদেশি সনাক্তকরণ ট্রাইব্যুন্যাল, এনআরসি নবীকরণ, পুশ্‌ব্যাক্‌ বা বহিষ্কার ইত্যাদি। পুলিশ যাকে ইচ্ছা বিদেশি তকমা লাগিয়ে ডিটেন্‌শন ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, যখন ইচ্ছা ভোটার তালিকায় নামের পাশে ডি শব্দটি লিখে দিচ্ছে। ডি মানে সন্দেহভাজন। ফলস্বরূপ হতভাগ্য লোকটি ভোট দেওয়ার অধিকার হারিয়ে ফেলবেন। তার স্থান হবে ডিটেন্‌শন ক্যাম্পে, যা জার্মানিতে হিটলারের সময়কালে মান্যতা পেয়েছিল কন্‌সেন্ট্রেসন ক্যাম্প নামে।

এইসব অমানবিকতার অবসান কল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙালি হিন্দুদের সুরক্ষায় দুটি নোটিফিকেশন জারি করে। এই নোটিফিকেশন বলে তাদেরকে ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইন এবং ১৯৫০ সালের পাসপোর্ট আইনের আওতার বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই আদেশ এখনও অসমে কার্যকরী হয়নি। সর্বানন্দ সনোয়াল পরিচালিত বিজেপি সরকার গত এক বছর যাবৎ অসমে শাসনকার্য চালাচ্ছে। হতভাগ্যরা আশা করেছিলেন বিজেপির শাসনে হয়তো তাদের ভাগ্যে একটা পরিবর্তন আসতেও পারে। কিন্তু ঘটনা প্রবাহে মনে হচ্ছে অবস্থাটা যেন একটা বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া ধারণ করেছে। অসমে বর্তমানে ১০০টি বিদেশি ট্রাইব্যুনালে তথাকথিত অভিযুক্তদের বিচার প্রক্রিয়া চলছে। এতে অনেকেই বিদেশি তকমা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। তাতে কিন্তু চক্রান্তকারীরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাদের নব সংযোজন স্ক্রিনিং কমিটি তৈরি করা। রাজ্যের মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে সর্বানন্দ সনোয়াল সরকার স্ক্রিনিং কমিটি তৈরি করে দিয়ে ট্রাইব্যুনালে ঘোষিত স্বদেশিদের মামলা ফের খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে। শুধু সেই রায়গুলিই পর্যালোচনা করা হচ্ছে, যেগুলিতে অভিযুক্তকে ভারতীয় নাগরিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হেরে যাওয়া রায়গুলির ব্যাপারে পর্যালোচনার কোনো সংস্থান উক্ত স্ক্রিনিং কমিটির হাতে দেওয়া হয়নি। পর্যালোচনার পর ট্রাইব্যুনালের সেই রায়গুলিকে পুনর্বিচারের জন্য হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অসমের হিন্দু বাঙালি মন্ত্রী-বিধায়করা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। হতভাগ্য উদ্বাস্তুরা প্রতিনিয়ত বিদেশি তকমার নামে নির্যাতিত হচ্ছেন। বরাক তথা অসমের বাঙালিরা বাস্তব অর্থে নেতৃত্বহীন। অতীতে অসমের বাঙালিদের বিপদে আমরা পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি। ১৯৬০ সালের ‘বাঙালখেদা আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়-সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৬১ সালে ভাষা আন্দোলনে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়রা আমাদের পাশে থেকে শক্তি জুগিয়েছিলেন। বর্তমানে সেই পশ্চিমবঙ্গ নীরব দর্শক। যদিও ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশ থেকে আগত পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী হতভাগ্যদের অনেকেই এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না যে অসমের অনুরূপ বহু সমস্যা তাদের পিছনেও ধাওয়া করছে।

—জহরলাল পাল,
শিলচর, অসম।

দুই নৌকোয় মমতা

এ রাজ্যের আগমার্কা সেকুলারবাদী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি জলপাইগুড়ি স্টেডিয়ামের এক সভায় বলেছেন, তিনি দুর্গাপুজোও করেন, ইফতারেও যান। কিন্তু পুজো করার অধিকারী হলেও তিনি ইফতারের অধিকারী নন। কারণ কোরান কোনো ‘কাফের’ (বিধর্মী)-কে ইফতারের অধিকার দেয়নি। ইফতারের অধিকার একমাত্র রমজান মাসে রোজা (উপবাস) রক্ষাকারী মুসলমানদেরই। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের চেয়ে বড় হিন্দু কেউ আছেন কি? অর্থাৎ, তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, তৈলঙ্গস্বামী, স্বামী প্রণবানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ গুরু, স্বামী নারায়ণ প্রমুখরা ‘বড় হিন্দু’ নন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ‘যত মত তত পথ’ বললেও ‘যত মত এক পথ’ বলেননি। এ কথার অর্থ, যে যে-মত পোষণ করবে সে সেই পথই অবলম্বন করবে। হিন্দু ও মুসলমানদের মত ও পথ এক নয়, ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ, শ্রীরামকৃষ্ণ সবধর্মের মাহাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞাত হতে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলাম, ঈশাই ইত্যাদি ধর্মাচরণের পরেও তিনি তাঁর মা (কালী)-র চরণেই এসে ঠাঁই নিয়েছেন। আবার স্বামী বিবেকানন্দকে ‘সেকুলারবাদী’ সাজাবার প্রয়াস যাঁরা করছেন তাঁরা হয় ভণ্ড, নয়তো ক্ষমতালোভী রাজনীতিক। কারণ স্বামীজী বলেছেন, ‘সগর্বে বলো আমি হিন্দু’, ‘যেখানেই হিন্দু নাম দেখবে, তাকেই পরমাত্মীয় মনে করবে’ এমনকী তিনি এও বলেছেন, ‘...হিন্দু ধর্ম ছেড়ে কেউ বেরিয়ে গেলে যে শুধু সংখ্যায় মানুষই (হিন্দু) কমে যাচ্ছে তাই নয়, হিন্দুর শত্রু সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে’ (প্রবুদ্ধ ভারত : এপ্রিল, ১৮৯৯)। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্বের প্রতি স্বামীজীর গভীর মমত্ববোধ। সর্বধর্ম সমন্বয়ের নামে ভণ্ডামির কথা বলেননি, যা তেলে-জলে মেলানোর শামিল। মমতা যখন বিজেপির সঙ্গে ঘর করেছেন তখন বিজেপি ছিল দেশপ্রেমিক। কিন্তু সেকুলারবাদের ভূত তাঁর ঘাড়ে চেপে বসার পর তাঁর কাছে বিজেপি ‘সাম্প্রদায়িক’। তিনি শঙ্খ ও আজানের ধ্বনি এক সঙ্গে শুনতে পান। কারণ হিন্দুরা পরমতসহিষ্ণু, ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবিক। আর ইসলামিক

বা মুসলমানগরিষ্ঠ বাংলাদেশে আজান আছে কিন্তু শঙ্খধ্বনি নেই। মমতা কী এসবের খবর রাখেন? জয়ললিতা ও মায়াবতী দুটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কই, তাঁদের তো মুসলমান ভোটে দাঁও মারতে 'হিন্দুমান' হতে দেখিনি। দেখিনি হিজাব পরে নমাজ পড়ার ভঙ্গিমা করতে, কথায় কথায় ইনশাল্লা, খোদাহাফেজ বলতে বা ঈশ্বর-আল্লার নামে শপথ নিতে। আসলে মমতা দুই নৌকোয় পা রেখে চলছেন। কিন্তু এবারের রামনবমীর উৎসবে এ রাজ্যের জেলায় জেলায় রামভক্তদের মিছিল জনজোয়ারে পরিণত হওয়ায় শাসকদলের নেতা-কর্মীরা ভিরমি খেয়েছেন। ঘোর কাটিয়ে তাঁরাও নেমেছেন হনুমান জয়ন্তীর মিছিলে। তবে তাঁদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রামভক্তদের দাপটকে প্রতিহত করতে নিজেকে 'বড় হিন্দু' প্রমাণে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁর মুখে শুধু 'হিন্দু', 'হিন্দু' রব। কিন্তু কেন? তাঁর মনে রাখা উচিত, দুই নৌকোয় পা দিয়ে চললে একূল-ওকূল দু'কূলই হারাতে হয়। তাই তো গীতা বলছে, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

শিবাজী মহারাজ

বিনীত নিবেদন যে স্বস্তিকার ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ সংখ্যায় 'ভারতবর্ষের মুক্তির স্বপ্নদাতা শিবাজী মহারাজ' সংক্রান্ত লেখায় (পৃষ্ঠা-৩১) একটি ভুল তথ্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। লেখা হয়েছে যে 'আফজল আলোচনার ছলে শিবাজীকে....তাঁকে ছুরিকাঘাত করে।.......... শিবাজী বেঁচে যান এবং সঙ্গে থাকা বাঘনখ ও ছুরিকা দিয়ে আফজল খাঁকে মারাত্মক আহত করেন।' এর সম্পর্কে আমার বক্তব্য যে তথ্যটা একদম উল্টো। ইতিহাস সিদ্ধ তথ্য হচ্ছে যে শিবাজীর মতো বীর রাজনীতিবিদ এই ভুল করতেই পারতেন যদি উনি আফজল খাঁকে প্রথম আঘাত করার সুযোগ দিতেন। বাস্তবে শিবাজী তো আফজল খাঁকে মারার উদ্দেশ্য নিয়েই ওঁর কাছে গিয়েছিলেন, ওঁকে নিজের পছন্দ মতো জায়গায় শিবির করার পরিস্থিতি তৈরি করেছিলেন। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিবাজী প্রথম আঘাতে খাঁকে মেরে ফেলেছিলেন। খাঁ তো শিবাজীকে প্রথম আঘাত করার সুযোগই পায়নি। সে সুযোগ শিবাজী ওঁকে আদৌ দেননি।

—**বাসুদেব ঝুনঝুনওয়ালা,**
কলকাতা।

শ্রীকৃষ্ণ-দুর্যোধন সংবাদ

অমলেশ মিশ্র তাঁর নিবন্ধে (স্বস্তিকা ৩.৪.১৭), লিখেছেন— 'শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে ধর্মের কথা বলতে চাইলে দুর্যোধন বলেন যে, তিনি জানেন ধর্ম কী এবং অধর্ম কী। তবু তিনি ধর্মের পথে না গিয়ে অধর্মের পক্ষেই থাকবেন কারণ ধর্মে তাঁর প্রবৃত্তি নাই আর অধর্ম থেকে তিনি নিবৃত্ত হতে পারবেন না।' মহাভারতে তা বলে না। পাণ্ডবদের দাবির অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন— কেশব, পূর্বে আমার পিতা পাণ্ডবগণকে যে রাজ্যাংশ দিতে চেয়েছিলেন, আমি জীবিত থাকতে পাণ্ডবরা তা পাবেন না। যখন আমি অল্পবয়স্ক ও পরাধীন ছিলাম, তখন অজ্ঞতা বা ভয়ের বশে পিতা যা দিতে চেয়েছিলেন এখন তা আমি দেব না। সূচীর অগ্রভাগে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হয়, তাও আমি ছাড়ব না'— (উদ্যোগ পর্ব, ১২৬ অধ্যায়)।

শ্রী মিশ্রের উল্লেখিত কথাগুলি, দুর্যোধন কখন, কোথায়, কাদের কাছে বলেছিলেন, যে কথা আমি 'যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি' শীর্ষক লেখায় (চিঠিপত্র, ১০.৯.১৫) বলেছি। বাহুল্যবোধে সে সবের পুনরাবৃত্তি করলাম না।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

জগত্তারণ লাহিড়ী

আমার পিতৃদেব প্রয়াত জগত্তারণ লাহিড়ী স্বস্তিকার একজন গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন। আমৃত্যু তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শ্রীরামপুর মহকুমার সঙ্ঘচালক ছিলেন। এই বঙ্গাব্দ তাঁর জন্মশতবর্ষ। সেই প্রসঙ্গেই এই চিঠি।

পিতার একমাত্র সন্তান হওয়ায় স্বভাবতই তিনি আমাকে ভালবাসতেন। আরও ভালবাসতেন দেশকে। পরাধীন ভারতবর্ষে (২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরাধীনতার জ্বালা তিনি রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করেছিলেন। প্রথম জীবনে হিন্দুমহাসভার সমর্থক ছিলেন। পরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার স্বয়ংসেবক স্বর্গীয় নরেশ গঙ্গোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য আমাদের বাড়িতে ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় তিনি শ্রীরামপুরে সঙ্ঘের শাখার সঙ্গে যুক্ত হন। এই শাখার বর্তমান নাম শিবাজী শাখা। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ তথা বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। এর ছ' মাসের ব্যবধানে গান্ধী হত্যার মিথ্যা অজুহাতে সঙ্ঘকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। তিনি আত্মগোপন করে সঙ্ঘের কাজ করতেন। নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে তিনি নগর কার্যবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে মহকুমা সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থা জারি করা হয় এবং সেইসঙ্গে সঙ্ঘকে দ্বিতীয়বার বেআইনি ঘোষণা করা হয়। আমার পিতৃদেবকে 'ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া' আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। কারামুক্তির পর জনতা পার্টি গঠনে (বিশেষত হুগলী জেলার) ব্রতী হন। ১৯৭৭-এ কংগ্রেস পরাজিত হলে সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা রদ হয়। এর পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। ১৯৮৩-তে একাত্মতা যজ্ঞ রথযাত্রায় তিনি জেলার নেতৃত্ব দেন। ১৯৮৯-৯০-এ রামমন্দির পুনর্নির্মাণের আন্দোলন বাংলা তথা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্ঘের নির্দেশে তিনি স্থানীয় রামশীলা পূজার নেতৃত্ব দেন।

১৯৯২-এ তৃতীয় বারের জন্য সঙ্ঘ বেআইনি ঘোষিত হলে তিনি কয়েকদিনের জন্য আত্মগোপন করেন। ১৯৯৬-এর ১২ ডিসেম্বর তিনি প্রয়াত হন। জন্মশতবর্ষে তাঁকে প্রণাম জানাই।

—**শুভাশিস লাহিড়ী,** শ্রীরামপুর, হুগলী।

ভারতে গুরু পরম্পরা

সুকান্ত মজুমদার

পৃথিবীর বুকে সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে বর্তমানের তথাকথিত আধুনিক সময় পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছে আবার কালের পরিহাসে সম্পূর্ণভাবে বিলীনও হয়ে গেছে। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে নতুন জীবনযাত্রা, ভিন্ন সভ্যতা। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই প্রাচীনকাল থকে আজ অবধি তার স্বকীয় ভাবধারা ও রূপরেখা শুধু ধরে রাখেনি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানবকল্যাণকারী যুগোপযোগী সবরকমের পরিবর্তনকেও সাদরে গ্রহণ করেছে। ভারতীয় তথা সনাতন হিন্দু সভ্যতাকে তার স্বরূপ ধরে রাখতে সাহায্য করেছে তার ধর্মীয় আদর্শ, রীতিনীতি, আচার আচরণ তথা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য।

গুরু পরম্পরা হিন্দু সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের সংস্কৃতিতে 'গুরু' কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দ্যোতক নয়। গুরু এখানে গুরুত্বের প্রতীক, গরিমা এবং পূর্ণতার প্রতীক। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

'গুকারশ্চান্ধকারো হি যুগাস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞানগ্রাসকংব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ।।

অর্থাৎ 'গু' হলো অন্ধকারের নাম আর 'রু' হলো আলোকের নাম। সেজন্য যিনি অজ্ঞানতা রূপ অন্ধকারকে দূর করেন— তিনি 'গুরু'।

স্বামী বিবেকানন্দ নিউ ইয়র্কে 'ভক্তি' সম্পর্কে তাঁর এক বিখ্যাত ভাষণে বলেছিলেন, 'যে আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হয় তাহাকে গুরু বলে।' অর্থাৎ গুরু সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন— যিনি তাঁর শিষ্যকে পরিচালিত করবেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে।

বর্তমানের আধুনিক কর্মচঞ্চল ও প্রযুক্তির অতি নির্ভরতার যুগে গুরুর কি কোনো প্রয়োজন আছে? এ প্রশ্ন মাঝে মাঝেই আমাদের মনে উঠতে পারে। বর্তমানের প্রথাগত শিক্ষায় অতি শিক্ষিত বা উচ্চবৃত্তিজীবী কিছু মানুষ আবার মনে করেন, মানুষের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি, কৌশল ও সামর্থ্য যদি থাকে তাহলে গুরুর কোনো প্রয়োজন নেই।

লৌকিক জগতে দেখা যায়, মানুষের বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মানুষ কখনো কখনো পথভ্রান্ত হয় ও নিজের ভুল বুঝতে পারে না। লৌকিক বিষয়ে মানুষের বিচারবুদ্ধি থাকলেও পারমার্থিক বিষয়ে মানুষ স্বভাবতই ভ্রান্ত। রজো ও তমো বৃদ্ধিতে মানুষ ধর্মাধর্ম ও কর্মাকর্ম নির্ণয়ে অসমর্থ। তাই প্রাচীনকাল থেকেই আমরা দেখতে পাই, যাঁদের আমরা ঈশ্বর সমতুল্য রূপে মানি, সেই মহাপুরুষদেরও গুরুর প্রয়োজন হয়েছে। যেমন— স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মহামুনি বশিষ্ঠদেবকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপমন্যু ও সান্দীপানিকে, আদি শঙ্কর গোবিন্দপাদকে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বরপুরী ও কেশব ভারতীকে, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু হিসেবে স্বীকার

করেছেন। আমাদের ইতিহাসে সাধকবৃন্দ ছাড়াও বড় বড় সম্রাট ও রাজারাও গুরুর সান্নিধ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন— রাজা বিন্দুসার ভগবান বুদ্ধ, সম্রাট অশোক সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বিষ্ণুগুপ্ত তথা চাণক্য, ছত্রপতি শিবাজী সমর্থস্বামী রামদাসকে গুরু হিসেবে বরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, ওই মহান গুরুর পথনির্দেশকে পাথেয় করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা রূপে ইতিহাসের পাতায় অমরত্বলাভ করেছেন। তাই ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বেদ পুরাণ, স্মৃতি সর্বত্র এই গুরুর আবশ্যিকতা স্বীকৃতি পেয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে— 'তমেব বিদ্বিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।' অর্থাৎ একমাত্র তাঁকে জানার মধ্য দিয়ে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে। ভয় থেকে অভয়ের মাঝে যখন মানুষের উত্তরণ ঘটে, মানুষ তখন অন্য এক নতুন জীবনে প্রবেশ করে। পরিবর্তনশীল জগতের মাঝে অপরিবর্তনীয় আত্মার অবিনশ্বরতা— এটিই ভারতীয় সংস্কৃতির বাণী এবং আমাদের গুরুরা এই বাণীরই বাহক ও প্রচারক। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই আমাদের বিশিষ্ট গুরুরা তাঁদের শিষ্যদের সঠিক পথে পরিচালিত করে দেশ ও সমাজের মঙ্গল সাধন করেছেন।

ভারতের এই গুরুপরম্পরা কত প্রাচীন তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রঘু, তিনি কৌৎস্যকে গুরু বলে মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ সুপ্রাচীনকাল থেকেই গুরুপরম্পরা ভারতের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলি যা ইতিহাসের রূপান্তর মাত্র, তাতে বিশিষ্ট গুরুদের উল্লেখ রয়েছে। যেমন— ধৌম্য, উপমন্যু, চাণক্য, স্বামী রামদাস। তবে মহাভারতের সময়ে এই ভারতভূমিতে এক বিশেষ প্রতিভার আত্মপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই। বিষ্ণুপুরাণে বেদব্যাসকে বিষ্ণুর অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান এ থেকেই অনুমান করা যায়। তিনি বেদকে একাধারে যেমন ব্যবস্থিত করেন— যা থেকে তাঁর নাম হয় বেদব্যাস। অপরদিকে, বেদের জ্ঞানকে সাধারণ জনগণের কাছে সহজলভ্য ও আকর্ষণীয় করার জন্য রচনা করেন পঞ্চমবেদ মহাভারত ও পুরাণ। তিনিই প্রথম গুরু-শিষ্য পরম্পরাকে ভারতীয় সমাজের কাছে সমাদৃত করে তোলেন। সুমন্ত, পৈল, জৈমিনি, পুলস্ত ও প্লক্ষ আদি তাঁর দশ শিষ্যকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে মহাভারত ও পুরাণের জ্ঞানকে জনসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলেন। তাই তাঁর জন্মতিথিই গুরুপূর্ণিমা রূপে আমাদের সমাজে পালিত হয়ে এসেছে হাজার হাজার বছর ধরে। ব্যাসদেবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে আমরা অনেক গুরুরই সন্ধান পাই, কিন্তু ব্যাসদেবের মতো প্রতিভা ইতিহাসে সত্যই দুর্লভ। তিনি একধারে যেমন মহাভারত রচনা করেছেন আবার তিনিই মহাভারতের অন্যতম চরিত্র। মহাভারতে বিভিন্ন সময়ে এসে তিনি সমাজকে পথনির্দেশ দিয়ে নতুন পথে পরিচালিত করেছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরুকে স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে তথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সন্ত কবীর বলেছেন, গুরুর স্থান ঈশ্বরেরও উপরে, কারণ তার শিক্ষার মাধ্যমেই ঈশ্বর লাভ সম্ভব হয়। অর্থাৎ গুরু ঈশ্বরের সমতুল্য। এই ঈশ্বররূপী গুরুর আদেশ তাই শিষ্যদের কাছে সর্বদা মান্য। তাই আমরা দেখি উপমন্যু শিষ্য আরুণি গুরুর আদেশানুসারে সারারাত শুয়ে থেকে জমির জল আটকে রাখতে পারেন। শিবাজী সমর্থগুরু রামদাসের কথায় মুহূর্তের মধ্যে রাজপাট গুরুর চরণে নিবেদন করতে পারেন। ভারতীয় সমাজ একদিকে যেমন দিকপাল গুরুদের জন্ম দিয়েছে তেমনি সেই গুরুরা তৈরি করেছেন তাঁদের উপযুক্ত শিষ্য।

কারা হতে পারেন গুরু? হিন্দু সমাজে গুরুপরম্পরা কি শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? উত্তর হলো 'না।' হিন্দু সমাজে যে কোনো সমাজের লোক গুরু হতে পারতেন। গুরু বিশ্বমিত্র ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশজাত। এমনকী চর্মকার সমাজ থেকে রবিদাস, বর্তমান সময়ে নমঃশূদ্র সমাজের হরিদাস ঠাকুর গুরু রূপে হিন্দুসমাজে পূজনীয়।

ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর সঙ্ঘের গুরু হিসেবে পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজকে সমাজের সামনে নিয়ে আসেন। গৈরিক পতাকা যুগ যুগ ধরে ভারতের চিরন্তন ও শাশ্বত সত্যকে প্রতিফলিত করে আসছে। ভারতের অস্তিত্ব, সংস্কৃতি তথা দেশের বৈভবশালী ইতিহাস যত প্রাচীন, গৈরিক পতাকাও তত প্রাচীন। বৈদিককাল থেকেই চলে আসছে এই পতাকার পরম্পরা।

রামায়ণে আমরা দেখতে পাই রামচন্দ্রের স্বর্ণধ্বজ। মহাভারতে অর্জুনের রথের ওপরে উড়তো গৈরিক পতাকা, শ্রীকৃষ্ণের রথের উপরে থাকত গরুড় চিহ্নিত গৈরিক পতাকা। এমনকী সিন্ধু প্রদেশের রাজা জয়দ্রথের পতাকাও ছিল বরাহ চিহ্নিত গৈরিক পতাকা অর্থাৎ হিন্দু রাজারা প্রায় সকলেই গৈরিক পতাকা ব্যবহার করতেন। এই গৈরিক পতাকা সমগ্র ভারতের এক অখণ্ড জাতীয় সত্তার পরিচায়ক। পরবর্তীকালে ছত্রপতি শিবাজী, হরিহর বুক্ক, প্রতাপরুদ্র নিজেদের পতাকা হিসেবে গৈরিক ধ্বজকেই ব্যবহার করেছেন। শিবাজী মহারাজ যে স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য তৈরি করেছিলেন, তিনি ছিলেন তার নিয়মতান্ত্রিক প্রধান— গৈরিক পতাকার প্রতিনিধি মাত্র।

অর্থাৎ গৈরিক পতাকাই সনাতন ভারতের চিরন্তন প্রতীক, তাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এই গৈরিক ধ্বজকেই গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে। আমাদের ইতিহাসে এইরূপ বহু প্রতীকী গুরুর সন্ধান পাওয়া যায়। গুরু দ্রোণাচার্যের মূর্তিকে গুরু মেনে একলব্য অস্ত্রশিক্ষা করেছিলেন। শিখ সম্প্রদায় পবিত্র গ্রন্থসাহেবকে 'গুরু' হিসেবে মানে। 'গুরু' থেকে শক্তি তার শিষ্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক। গৈরিক পতাকা থেকে ত্যাগের শক্তি সঞ্চারিত হয়। তাই সচল বা দেহধারী না হয়েও গৈরিক ধ্বজ ঐশ্বরিক শক্তি বা তেজ সঞ্চারিত করে চলেছে তার হিন্দু সমাজের মধ্যে। সঙ্ঘের শাখায় নিত্যদিন গৈরিক পতাকার সামনে হৃদয় স্পর্শ করে স্বয়ংসেবকরা প্রার্থনা করেন 'নমস্তে সদাবৎসলে মাতৃভূমে...।

সনাতন প্রথা অনুসারে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা প্রতি বছর ব্যাসপূর্ণিমা বা গুরুপূর্ণিমার দিন গুরুজ্ঞানে গৈরিক পতাকার পূজা গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন। সারা বছর গুরুর সামনে শিক্ষা নেওয়ার পর এই দিন গুরুর প্রতি সমর্পণের পরীক্ষা। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় পরম্পরায় শিক্ষান্তে গুরুদক্ষিণা প্রদানের রীতি রয়েছে। দান ও দক্ষিণার মধ্যে পার্থক্য হলো—দানে গর্ব থাকে; দক্ষিণার ক্ষেত্রে গর্ব, অহঙ্কারের কোনো স্থান নেই। যিনি দক্ষিণা দিচ্ছেন, তিনি মাথা নীচু করে শ্রদ্ধা জানাবেন আর গ্রহীতা নেবেন মাথা উঁচু করে। আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা প্রদানের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা কী? ঋষি বঙ্কিম আনন্দমঠে লিখেছেন— "অভ্যন্তর থেকে প্রশ্ন এল, কি দিতে পারবে?' মহেন্দ্র দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলেন, 'জীবন', পুনরায় সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'জীবন তো তুচ্ছ!' আর কি দিতে পারবে?' মহেন্দ্র ভেবে পান না জীবনের থেকে বড় আর কি দেওয়ার থাকতে পারে। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কি দিতে হবে? উত্তর এল ভক্তি, গুরুর প্রতি অবিচল ভক্তিই হলো সর্বোত্তম গুরুদক্ষিণা"। ভারতের সংস্কৃতিতে তা সে একলব্যই হোক বা আদি শঙ্করের শিষ্য পদ্মপাদন— সকলেই গুরুদক্ষিণার উৎকৃষ্ট উদাহরণ রেখে গেছেন। পদ্মপাদন তাঁর কঠোর তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারকে স্বীয় শক্তিতে আত্মস্থ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর শক্তিকে জীবনে একবারই ব্যবহার করতে পারবেন— এই শর্ত ছিল। এক কাপালিক শঙ্করাচার্যকে যখন হত্যা করতে উদ্যত হলো, তখন দূর থেকে দেখে পদ্মপাদন সেই শক্তিকে ব্যবহার করেন এবং কাপালিকের দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আদি জগদ্‌গুরু যখন প্রশ্ন করলেন, পদ্মপাদন এ তুমি কী করলে? তোমার সারা জীবনের সাধনার সম্পদ নিঃশেষ করে ফেললে? পদ্মপাদন ভক্তিভরে সবিনয়ে বললেন, 'সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদই তো

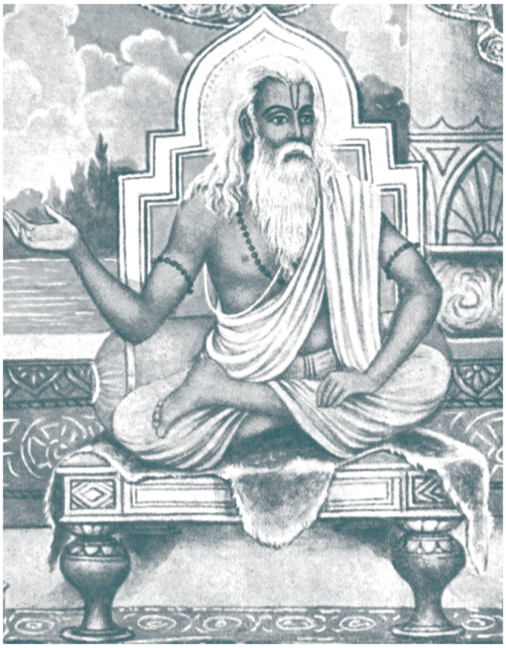

গুরুদক্ষিণার যোগ্য', পদ্মপাদনের এই সমর্পণের উৎস হলো ভক্তি। রাষ্ট্রভক্তিও যে কতটা সমর্পণমুখী হতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন ভামাশাহ। মহারাণা প্রতাপ যখন মেবার-হারা হয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অর্থের অভাবে অস্ত্রবল ও সৈন্যবল সীমিত, রানা ধীরে ধীরে তাঁর হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশা প্রায় ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে বসেছেন, সেই সময় ভামাশাহ মহারাণার কাছে এসে সবিনয়ে বললেন, 'আজ মাতৃভূমির ঘোর দুঃসময়ে আমার সঞ্চিত অর্থ যদি কাজে না লাগে, তাহলে দেশের সন্তান হিসেবে আমি কী করতে পারলাম'? তিনি তাঁর সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ দান করলেন প্রতাপের চরণে। ভামাশাহ আরও বললেন, 'আপনি একে দান বলে মনে করবেন না, মাতৃভূমির প্রতি এ আমার শ্রদ্ধা-সমর্পণ'। ভামাশাহের এই সর্বস্ব অর্পণও এক ধরনের গুরুদক্ষিণা— যা তিনি তাঁর মাতৃভূমি মেবারের জন্য সমর্পণ করেছিলেন।

গুরু পূর্ণিমা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের কাছে পরীক্ষার দিন, সমর্পণের দিন। সঙ্ঘের শাখায় প্রতিদিন গৈরিক পতাকার নীচে শিক্ষাগ্রহণের পর বৎসরান্তে নিবেদিত গুরুদক্ষিণারূপী এই সমর্পণ একটি অতি উত্তম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে গড়ে ওঠে দেশভক্তি তথা দেশ ও সমাজের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের মানসিকতা। সঙ্ঘের সারাবছরের সাংগঠনিক খরচ এই গুরুদক্ষিণার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বাইরের লোকেদের কাছে সত্যিই এ এক মহা আশ্চর্যের বিষয়! কারণ বর্তমান সমাজ দেখতে অভ্যস্ত যে বিভিন্ন সংগঠন সমাজ থেকে চাঁদা তোলে, কিন্তু সঙ্ঘ চাঁদা তোলে না। অনেকে তাই সঙ্ঘের সাংগঠনিক খরচের উৎস সম্পর্কে নানারকম কল্পকাহিনি গড়ে তোলেন। কারণ সমর্পণ কী, তা তাদের ধারণাতীত। গুরুপূর্ণিমার দিন গুরুগৈরিকের সামনে তাঁরই দেওয়া শিক্ষাকে সম্বল করে প্রতিটি স্বয়ংসেবকের ভক্তিভরে সমর্পণের দিন।

(শ্রীগুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

(লেখক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সুষমার হাত ধরে ঘরে ফিরলেন উজমা

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

কিছু ভারতীয় মহিলা বিদেশি পুরুষদের সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বপ্নভঙ্গ বা মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগে না। এদের মধ্যে কোনো কোনো ভাগ্যবতী আবার নিজের দেশের মাটিতে ফিরে আসতে পারেন, আর বেশিরভাগই এমন গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যান, তিনি ফিরেও আসতে পারেন না। এতকিছু সত্ত্বেও উজমা আহমদের মতো আধুনিক মহিলা একই ভুল করে বসেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী উজমার সঙ্গে তাহিরের আলাপ এবং প্রেম হয় মালয়েশিয়াতে। এরপর পাকিস্তানে বন্দুকের ডগায় তাহির তাঁকে বিয়ে করে। সেখানে পাকিস্তানের অন্যান্য পরিবারের মতো তাহিরেরও একাধিক স্ত্রী বর্তমান। উজমাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এরই মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে তিনি তাহিরকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ইসলামাবাদে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে নিয়ে আসেন এবং দূতাবাসের আধিকারিকদের সব ঘটনা খুলে বলেন।

যখন পাকিস্তানে ভারতীয় দূতাবাসের অফিসার জে.পি. সিংহ বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজকে এ ব্যাপারে জানান, তখন শ্রীমতী স্বরাজ সর্বপ্রথম উজমার ভারতীয় নাগরিকতা বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে নির্দেশ দেন। আসলে, গোড়ায় গলদ থেকে যাক, এটা তিনি চাননি। সেজন্য দিল্লিতে তিনি উজমার পরিবারের খবর নেন এবং তার ভাইকে নিজের বাসস্থানে ডেকে পাঠান। নিজের বাড়ি থেকে তিনি উজমাকে তার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, পাকিস্তানে ভারতীয় নাগরিক উজমার ওপর সত্যিই অন্যায়-অত্যাচার হয়েছে, তখন তিনি জে.পি. সিংহকে স্পষ্ট নির্দেশ দেন যে, এক বছর-দু'বছর— যতদিন না পর্যন্ত সুবিচার হচ্ছে, উজমা ভারতীয় দূতাবাসের ভেতরেই থাকবে। ভাগ্য ভালো, উজমার ভিসার মেয়াদ অনেকটাই ছিল। এর মধ্যে প্রতিদিন শ্রীমতী স্বরাজ গড়ে তিনবার ফোনে উজমার খোঁজ-খবর নিতেন, তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতেন, আশ্বস্ত করতেন। অস্থির হয়ে পড়লে জে.পি. সিংহকে নির্দেশ দিতেন উজমাকে কোনো কাজ দিতে; কারণ কাজের মধ্যে থাকলে দুশ্চিন্তা কম হয়। আসলে স্বামী তাহিরের পক্ষ থেকে পাকিস্তানে এফ. আই. আর করা আর দূতাবাসের বাইরে গণ্ডগোলের জন্য উজমা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

এদিকে ভারতের বিদেশমন্ত্রক থেকে অক্লান্ত চেষ্টা করা হয় উজমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। অবশেষে মুক্তির দিন এল। সেদিন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ নিজে ওয়াঘা বর্ডারে ভারতীয় দূতাবাসের গাড়ির ভেতর কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছেন এবং বার বার ফোনে উজমার মুক্তির খবর নিয়েছেন। তারপর বর্ডারের গেট খুলেছে এবং উজমা ভারতে প্রবেশ করেছেন। শ্রীমতী স্বরাজ বুকে টেনে নিয়ে স্বাগত জানান উজমাকে। উজমা দেশের মাটিকে চুম্বন করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

বাইরে থেকে কেউ জানতেও পারবে না যে, পাকিস্তানে মহিলাদের সঙ্গে কী অকথ্য অত্যাচার হয়। সেইজন্য আর কোনো মহিলা যেন তাঁর মতো ভুল না করেন— এই ছিল উজমার প্রতিক্রিয়া। সেদিন স্বস্তি ছিল বিদেশ মন্ত্রকের, স্বস্তি ছিল বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজের আর নিশ্চিন্তে নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে ফিরে আসা অত্যাচারিত ভারতীয় মহিলা উজমা আহমদের। প্রশাসনিক দৃঢ়তা, মানবীয় সংবেদনা এবং মানসিক ধৈর্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে উজমার এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। ধন্যবাদ ভারতের বিদেশ মন্ত্রক, ধন্যবাদ বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ— একজন ভারতীয় নারীর জন্য এতকিছু করার জন্য। ■

‘অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান’

বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে— ‘সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি, দুখ যায় তার ঠাঁই।’ শান্তি অশান্তি সম্বন্ধেও বোধ হয় একই কথা বলা চলে। ছোটবেলায় শান্তি বলে আমাদের এক বন্ধু ছিল, ঠাকুরমার নয়নের মণি। চোখে না দেখলেই অন্ধকার; ‘অ শান্তি, অ শান্তি’ রবে পাড়া মাথায় করে তুলতেন। সেই থেকে আমাদের কাছে তার নাম হলো অশান্তি। আদরে বাঁদর হয়ে পরবর্তী জীবনে সে হয়ে উঠল এক মূর্তিমান অশান্তি, আজ এর মাথা কাটে, তো কাল ওকে চমকায়। এমনই এক অ্যাকাশনে বেঘোরে প্রাণটা না গেলে, পরে তার একজন মহাবলী মিনিস্টার হওয়া কেউ আটকাতে পারত না। শান্তির প্রতিষ্ঠায় এহেন অশান্তির আবির্ভাব সেই কোন পুরাকাল থেকে পুনরাবর্তিত হয়ে চলেছে। কিন্তু সেই অশান্তির অন্তরে শান্তি সুমহানকে আবিষ্কার করার জন্যে মানুষেরও চেষ্টার শেষ নেই। ঠিক গ্রিকপুরাণবীর সিসিফাসের বারেবারে গড়িয়ে পড়া পাথরকে আবার পাহাড়ে টেনে তোলার অক্লান্ত আয়াসের মতো। আমাদের অশান্তির পাহাড়েও, কী পুবে আর কী পশ্চিমে, শান্তির পাথর প্রতিষ্ঠার জন্যে দেশজুড়ে শান্তির পারাবতদের অশান্তির আর শেষ নেই। তাঁরা নিজেরাই শুধু কথার পিঠে কথা কয়ে, হোক কলবর বলে ক্ষান্ত হচ্ছে না, কথার মাধ্যমে শান্তির পারাবার সৃষ্টি করার জন্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু মুশকিল হলো শুধু কথায় যদি অশান্তির চিঁড়ে ভিজত তাহলে আর শান্তি ফলানোর জন্যে কোনো বাধা থাকত না। তাই বোধ হয় মহাভারতের কালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শান্তির দৌত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে আটকাতে পারেনি। কারণ চোরা দুর্যোধন নাহি শোনে ধর্মের কাহিনি। শান্তিপর্ব আরম্ভ হয় সেই অনড় অটল দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর। কেননা বঙ্গের তিন দশকের মহান বামরাজত্ব প্রমাণ করেছে দুর্জনের সঙ্গে সুজনের মতো আচরণ করা বৃথা। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ এবং মূর্খস্য লাঠ্যৌষধিই হলো শাস্ত্রোক্ত পন্থা। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেও রাশিয়া পার পায়নি।

ন্যায়শাস্ত্রের একটি বহুশ্রুত বচন— ‘পর্বতোবহ্নিমান’ অর্থাৎ ধূম দেখেই পর্বতে বহ্নির প্রমাণ পাওয়া যায়। সেটি এখন আক্ষরিক অর্থে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে আমাদের হিমগিরির উত্তরে ও পূর্বে। মাঝে মাঝেই সেখানে ধুমধাড়াক্কা ধূমায়মান হয়ে ওঠে এবং অগ্ন্যুৎপাতেরও দেখা মেলে। একটু আধটু ভূকম্পও হয় কিন্তু বোধ হয় দমের অভাবে আবার ঝিমিয়ে পড়ে। ভূগোলে আছে, এইসব তথাকথিত জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সঙ্গে সহাবস্থান যুগ যুগ ধরে চলতে পারে। কিন্তু যে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে সমৃদ্ধ পম্পিনগর ছাইচাপা পড়ে যায় তার জাত আলাদা। সেখান থেকে মোটেই ধিকি ধিকি তুষের আগুন ধূমায়িত হওয়ার সুযোগ পায় না।

রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষেত্রেও তারই সাদৃশ্য মেলে। গণবিস্ফোরণের অগ্ন্যুদ্গারে যুগোশ্লোভিয়া বিশ্লিষ্ট হয়; মহান সোভিয়েত সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে, পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়। অপরদিকে এক শ্রেণীর অনমনীয় জেদের মুখে সুযোগ্য নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ সত্ত্বেও অটুট থাকে। পাকিস্তানি চক্রান্তে শোষিত জনগণের নিপীড়িত আর্তনাদ সত্য ছিল বলেই পাকিস্তানের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশের উদ্ভব হয়। সেই সত্যের সমর্থনে ভারতের ভূমিকা ছিল অনুঘটকের মতো। কাশ্মীরে সেই গণসত্যের অভাব আছে বলেই কৃত্রিম পাকিস্তানি সন্ত্রাস আজও লোক খেপিয়ে কূল পাচ্ছে না।

কাশ্মীর ও দার্জিলিংয়ের মহান বিপ্লব বাংলাদেশের সমসাময়িক হলেও সেখানে এখনও ‘বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক’ স্লোগানের মহড়া চলছে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রায় অর্ধশতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে। অতিবুদ্ধিমান বামপন্থী বুজরুকের দল দীর্ঘদিন ধরে ধাত্রীর ভূমিকায় সক্রিয় থাকলেও বৈপ্লবিক গর্ভযন্ত্রণার কৃত্রিমতাকে ফলপ্রসূ করতে পারছে না। পারবেও না বলে মনে হয়। কারণ এই দুটি লোকখেপানো কৃত্রিম আন্দোলনের মূলে কোনও এককাট্টা গণদাবির সত্য নেই। দুটির মূল ভিত্তি হলো, একদিকে কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় সরকারে দীর্ঘ কংগ্রেসি রাজত্বের দলবাজির রাজনীতি এবং অন্যদিকে দার্জিলিংয়ে বামপন্থী রাজনীতির ধান্দাবাজি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুষ্টিমেয় সুযোগসন্ধানী স্থানীয় রাজনীতিকের Politics of blackmail আর তাদের সহায় হয়েছে দোদুল্যমান Roman mob।

কাশ্মীর সমস্যার জনক হলেন মহান শান্তির পারাবত নেহরু যাঁর নির্বোধ নির্দেশে নিশ্চিত কাশ্মীর অধিকার স্থগিত রেখে, ব্রিটিশ দুরভিসন্ধির ক্রীড়ণক হয়ে নিজের ঘরের সমস্যাকে জাতিসঙ্ঘে টেনে নিয়ে গিয়ে অযথা নাস্তানাবুদ হতে হয়। এবং পরিত্রাণে ভেটো পাওয়ার আশায় সোভিয়েত রাশিয়াকে দাসখত লিখে দিয়ে non-align movement-কে এক পরিহাসের পাত্র করে তুলতে হয়। শেখ আবদুল্লাকে খুশি করতে অযথা যে ৩৭০ ধারার আমদানি করা হয় তার মেয়াদ ছিল নেহাতই সাময়িক। তারপরে একবার শেখ আবদুল্লাকে জেলে পুরেও পরে তাকে ছেড়ে দিয়ে কাশ্মীরে মোটামুটি একটি স্থিতাবস্থা চালু হয় ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

কিন্তু কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার গলা টিপে ধরেন মহীয়সী ইন্দিরা মহারানি যখন তিনি এক হীন ষড়যন্ত্রে কংগ্রেসি ধান্দাবাজির স্বার্থে নির্বাচিত ফারুক আবদুল্লা সরকারকে বরখাস্ত করে অনুগত বক্সী গোলাম মহম্মদকে

মসনদে বসিয়ে লুটের রাজত্ব কায়েম করতে সাহায্য করেন। কাশ্মীরের জনগণের আস্থায় যে গণতান্ত্রিক ধারা শিকড় গাড়তে শুরু করে তিনি সেটির মূলোচ্ছেদ করে কাশ্মীরে সর্বনাশের অগ্রদূত হয়ে ওঠেন। পুলিশ ও মিলিটারি দিয়ে নির্বাচনের প্রহসন করে সে সর্বনাশকে এড়ানো যায় না। একইভাবে অকালি দলকে শায়েস্তা করতে গিয়ে তিনি ভিনদ্রানওয়ালার ভূত তথা রাজকরেগা খালসার যে আগুনের সৃষ্টি করেন, নিজে সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে তার খেসারত দেন।

তারপর ধীরে ধীরে আবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর জনগণের বিশ্বাস ফিরে আসে যখন, অটলবিহারী বাজপেয়ীর কাশ্মীরিয়ত, জামুরিয়ত ও ইনসানিয়ত ক্রমে সাধারণ কাশ্মীরির মনে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করে। ফলে একবার উমর আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্স গণভোটে জিতে রাজত্ব করার পর তার একচ্ছত্র কাশ্মীরিয়ত দলের অবসান ঘটিয়ে মুফতি সাহেবের পিডিপি কাশ্মীরে জয়ী হয়ে ফিরে আসে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জম্মুতে জয়ী বিজেপির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুফতি সাহেবের মৃত্যু এবং বিজেপি সরকারের অংশীদার হওয়াতে স্বার্থান্বেষী চক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। এবং পাকিস্তানি সেবাদাস বুরহান ওয়ানির মৃত্যুতে গণক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে কাশ্মীরে দাবানল জ্বলে ওঠে এবং একবার তা ছড়িয়ে পড়লে তাকে আয়ত্ত করা অবশ্যই সময়সাপেক্ষ।

কাশ্মীর সম্বন্ধে বামপন্থী বিদ্যাদিগ্‌গজদের থিসিস যাই হোক না কেন, বাস্তব সত্য হলো, হাজার বছর যুদ্ধ হলেও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা নেহরুর বুদ্ধিভ্রংশতায় কাশ্মীরের যেটুকু অংশ হাতছাড়া সেটিতে পাক ও চীনের দুরভিসন্ধি প্রসূত কার্যকলাপ ইতিমধ্যেই ভারতের নিরাপত্তাবলয়ের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। সুতরাং ভারতের উত্তরাঞ্চলকে সুরক্ষিত রাখতে কাশ্মীরের শিথিলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে সেখানে পাক-চীন ও ইসলামিক খলিফাদের স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলতে দেওয়া হবে নেহাতই সুইসাইডাল। তাছাড়া কাশ্মীরের ভারতভুক্তি Instrument of accession অনুযায়ী সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ। কাশ্মীরে আজ পর্যন্ত বহু নির্বাচনে জনগণের মতের প্রতিফলন ঘটেছে। যার ফলে দুটি কাশ্মীরি দল পর্যায়ক্রমে কাশ্মীর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। কাশ্মীরে অর্থনৈতিক শোষণের পরিবর্তে সেখানে ভারত সরকারের জলের মতো অর্থব্যয় ঘটছে। কাশ্মীরে স্বায়ত্তশাসন রয়েছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রয়েছে, ব্যক্তিস্বাধীনতাও রয়েছে কিন্তু তাই বলে পাকিস্তান-প্ররোচিত ঢিল ছোঁড়ার স্বাধীনতা, বোমাবাজির স্বাধীনতা থাকবে কিনা সেটা কাশ্মীর সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

অনেক সাধুমহাজন অবশ্য আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর কথা বলেছেন; তার উত্তরে জীবনানন্দের মতে অনায়াসেই বলা যায়, কী কথা, এবং কাহার সাথে? যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী তাদের সঙ্গে কথার ভিত্তিটা কী? হুরিয়ত কাশ্মীরি পুলিশ মেরে বীরত্ব করলে তার সঙ্গে আবার কথা কী। যারা ঢিল ছুঁড়ে বা বোমাবাজি করে বীরত্ব করছে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে বাছারা ঢিল ছোঁড়া উচিত নয় তোমাদের। গিলানির মতো যাঁরা সদর্পে বলেন ভারতীয় নন, তাঁদের যে প্রয়োজনই হোক ভারতীয় পাশপোর্ট দেওয়া কেন? প্রয়োজনে একটা চিরকুট দিয়ে বর্ডার পার করিয়ে আর ঢুকতে না দেওয়াই ভালো। তাদের সুরক্ষার জন্যে পুলিশি ব্যবস্থাই বা কোন আইনে সিদ্ধ।

ডায়লগ অত্যন্ত ভালো কিন্তু সেটা নাটকের পক্ষেই শ্রেয়। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি প্রশ্নহীন এবং বাংলা ও পঞ্জাব যদি বিভাগ মেনে নেয় অখণ্ড কাশ্মীরের প্রশ্নই আসে না। ঢিল ছুড়লে পাটকেলটি খেতে হবে এটা স্বতঃসিদ্ধ; এবং তার মোকাবিলা করবে কাশ্মীর সরকার এবং তার পুলিশ। সেনাবাহিনী থাকুক সীমান্তরক্ষায়, সিআরপিএফ থাকুক সরকারি সম্পত্তিরক্ষায়। জনগণের বিক্ষোভ মোকাবিলা করুক কাশ্মীরি পুলিশ। মার খাবে না মার দেবে সেটা তাদের ব্যাপার। সংবাদে প্রকাশ, দশ হাজার কাশ্মীরি যুবক রক্ষাবাহিনীতে চাকরির জন্য আবেদন করেছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশকে নির্বাচিত করে, ট্রেনিং দিয়ে, হাতে লাঠি কাঁদানে গ্যাস, পেলেট গান দিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য নিয়োজিত করা হোক। সেনাবাহিনীর কনভয়ে ঢিল ছুঁড়লে সোজা সুট অ্যাট সাইট। এ ব্যাপারে বামপন্থীদের পিত্রালয় মহান রাশিয়ায় চেচনিয়া ও মহান মাতৃভূমি চীনে উঘুরিদের সমস্যা যেভাবে সামরিকভাবে সমাধান করা হয়েছে সেটা খুবই প্রণিধানযোগ্য। কাশ্মীর কাশ্মীরিদের এবং ভারতের অন্তর্গত। এই মূলভূমি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা অবশ্যই হতে পারে।

অন্যদিকে দার্জিলিংয়ের সমস্যার নাটের গুরু হলো পাকিস্তানের প্রবক্তা সিপিএম। সিপিএমের নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণ গোর্খাল্যান্ডের জিগির তুলে দার্জিলিংয়ে আগুন জ্বেলে পাহাড় দিয়ে কলকাতা ঘেরার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেও সুবিধে করতে পারেননি। শেষে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে গা ঢেলে দিয়ে বুজরুক পার্টি পাহাড়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক পার্টিতে সমৃদ্ধ করে আত্মসুখে বিভোর থাকে। কিন্তু আশির দশকে যখন সুভাষ ঘিসিং জিএনএলএফ করে তাণ্ডব শুরু করে তখন তাকে চুরির চিচিং ফাঁক খুলে দিয়ে ও অন্যায়ের একচ্ছত্র অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে সমস্যার দিকে চোখ বুজে থেকে ব্র্যান্ড বুদ্ধ এক বিরল মেরুদণ্ডহীনতার নিদর্শন রাখেন। মনে রাখতে হবে ব্রিটিশ-সৃষ্ট দার্জিলিং শহরে গোর্খারা বহিরাগত।

সুভাষ ঘিসিংয়ের একচ্ছত্র অধিকারের প্রতিবাদে তাঁরই সাগরেদ বিমল গুরুং গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে ঘিসিংয়ের হাত থেকে বেটন কেড়ে নিয়ে তাকে 'পুনর্মূষিকো ভব' করে ছেড়ে দেয়। এদিকে পরিবর্তনের জমানায় গুরুং ক্ষমতা ও চিচিংফাঁকের ভাগ নিতে জিটিএ গঠনে অংশগ্রহণ করে। পাঁচ বছর কেটে যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক নির্বাচনে মিরিকে তাদের পরাজয় ও হিসেব নিকেশের কথায় খেপে গিয়ে আবার গোর্খাল্যান্ডের দাবি করে পলিটিকস্ অব ব্ল্যাকমেল শুরু করে পাহাড়ে তাণ্ডব শুরু করে দেয়। স্বায়ত্ত শাসনের ও উন্নয়নের সংস্থা যখন স্বাধীনভাবে কার্যকরী তখন ভারতের সুরক্ষায় পাহাড়ের ওপরে চীনের দালালি করার জন্যে কোনও ক্ষুদ্ররাজ্য সৃষ্টির প্রশ্নই থাকে না। সুতরাং স্থির লক্ষ্যে অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান তার জন্য অবিচল থাকা প্রয়োজন। ■

সাক্ষাৎকার

কানের সমস্যা থেকেও ঘুরতে পারে মাথা

আমাদের শরীরের একটি দৈনন্দিন সমস্যা মাথা ঘোরা। নানা কারণে মাথা ঘোরে। কিন্তু কানের সমস্যা থেকে মাথা ঘুরতে পারে, এটা প্রথমে মাথাতেই আসে না কারোর। এই সমস্যা ও উপসর্গ নিয়ে দিনের পর দিন চিকিৎসা করিয়েও কোনো সুরাহা হয় না। কারণটাও থেকে যায় অজানা। কানের সমস্যায় কখন মাথা ঘোরে সেই বিষয়ে আলোকপাত করলেন বিশিষ্ট ই এন টি সার্জন **ডাঃ পীযূষকান্তি মান্না।** *কথা বললেন স্বপন দাস।*

● কান থেকে মাথাঘোরা, বিষয়টা যদি একটু বলেন।

একজন রোগীর উদাহরণ দিই। এক মাস আগে, বছর ৫৫-র এক ভদ্রমহিলা আমার কাছে এলেন। তাঁর অভিযোগ, তিনি ডান কানে খুব কম শুনছেন। আর সেই সঙ্গে ওই কানে ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ হচ্ছে সারাক্ষণ। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানলাম, দু' মাস আগে তাঁর প্রচণ্ড মাথাঘোরা শুরু হয়, সেই সঙ্গে বমি। তখন তিনি এক হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু কোনো উন্নতি না হওয়াতে একজন মেডিসিনের চিকিৎসককে দেখান। চিকিৎসক তাঁকে বলেন যে স্পন্ডিলাইসিস হয়েছে। তাই একজন হাড়ের চিকিৎসকের কাছে যাওয়া দরকার। দু' মাস ধরে হাড়ের চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন থেকে কোনো সুরাহা হচ্ছে না দেখে কানের সমস্যার কথা বলেন। তখন ওই চিকিৎসক তাঁকে একজন ইএনটি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলেন। তিনি আমার কাছে এলেন। তাঁর হিয়ারিং টেস্ট করে দেখা গেল যে তিনি তাঁর শ্রবণশক্তি বেশ খানিকটা হারিয়ে ফেলেছেন, যেটা আর কোনোদিন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে না। আর এই সব উপসর্গ দেখা দিয়েছে এই কারণেই।

● একটু বিশদে যদি বলেন।

মাথাধরা একটি খুব পরিচিত উপসর্গ। বেশিরভাগ মানুষ কোনো না কোনো সময়ে মাথাঘোরা রোগে ভুগেছেন। বেশিরভাগ মানুষ ভাবেন, শরীর দুর্বল বলে মাথা ঘুরছে। কেউ হয়তো ভাবেন ব্লাড গিয়ে মাথা ঘুরছে। অথচ প্রেসার মেপে দেখা গেল ব্লাড প্রেসার একদম স্বাভাবিক। তখন হয়তো কেউ ভাবলেন, তাহলে গ্যাস, অ্যাসিডিটি বা বদহজম থেকে মাথা ঘুরছে।

মাথা ঘোরার হাজারটা কারণ আছে। সঠিক কারণ জানতে গেলে, হয়তো মাথা সত্যিই ঘুরে যাবে। এটা ঠিক যে দুর্বল শরীর,

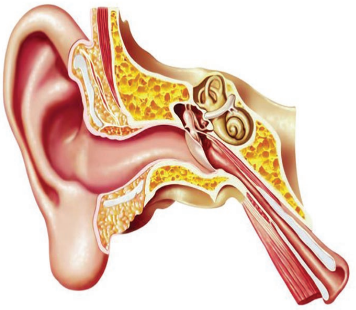

বদ হজমের বা উচ্চ রক্তচাপ কিংবা স্পন্ডিলাইসিসের ক্ষেত্রে মাথা ঘোরা একটি উপসর্গ হতে পারে। তবে মানুষ যেটা কখনই ভাবতে পারে না যে তাঁর কানদুটিও মাথা ঘোরার একটি কারণ হতে পারে।

আপনারা হয়তো ভাবছেন, সে কী কথা— কান, সে তো শব্দ শুনেই ক্ষান্ত হয়। বড় জোর ঠাণ্ডা লাগলে একটু কানব্যথা হওয়া কিংবা কানের ভিতর রস হওয়া, এটাই তো জানি। না, কানের কাজ মূলত তিনটি। ১। শব্দ শোনা, ২। দিক নির্ণয় করা— শব্দ শুনে বলে দেওয়া যায়, কোনদিক থেকে আওয়াজ আসছে। ৩। শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করা, এটা সেই ছোটবেলায় স্কুলের বইয়ে পড়া অন্তকর্ণ বা Inner Ear-এর কাজ।

● কী উপসর্গ দেখে বুঝব মাথা ঘোরার পিছনে কানের ভূমিকা আছে?

কান মূলত যে সব মাথাঘোরার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাথাঘোরার সঙ্গে এক বা একাধিক উপসর্গ থাকতে পারে। যেমন, ১। কান ভারী বা বন্ধ হয়ে যাওয়া। ২। কানে কম শোনা। ৩। বমি হওয়া বা বমির ভাব হওয়া। ৪। কানে ঝিঁঝি পোকা ডাকার আওয়াজ শোনা।

এইসব ক্ষেত্রে মাথাঘোরা কয়েক মিনিট থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। মনে হয় যেন চারিদিক বন বন করে ঘুরে যাচ্ছে এবং উঠে দাঁড়ালে হয়তো পড়েই যাব।

আরও একটি বিশেষ ধরনের মাথাঘোরা কানের সঙ্গে যুক্ত। আপনি হয়তো আরাম করে শোবেন বলে ডানদিকে পাশ ফিরলেন, সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা বন বন করে ঘুরে গেল। কিংবা ধরুন আপনি রান্নাঘরের তাক থেকে চিনির কৌটোটা নামাতে গিয়ে যেই ঘাড়টা উপরে তুললেন, অমনি মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল। যদিও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই মাথাঘোরাটা থেমে যায়, কিন্তু একটা ভয় মনে থেকে গেল, এই হয়তো ঘাড় ঘোরাতে গেলে মাথা ঘুরবে। এই বিশেষ মাথা ঘোরাকে BPPV (Begain paroxysual positional vetigo) বলে। এটি স্পন্ডিলাইসিসের থেকেও অনেক বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায়। এটি যদি ঠিকমতো ডায়গোনসিস হয়, তাহলে চিকিৎসায় খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়া যায়। নইলে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে এই উপসর্গ।

সব শেষে একটি কথা বলি, কান শুধু শোনার জন্য নয়। এটি শরীরের আরো অনেক কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই কানে সামান্য রকম কোনো অসুবিধা দেখা দিলেই একজন নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ■

অন্য রকম

পলবিন্দর কউর শেরগিল

কানাডায় সুপ্রিম কোর্টের প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চার বছরের ছোট্ট মেয়েটি কি জানত একদিন সে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে? বাবা পেশাগত প্রয়োজনে কানাডায় যাচ্ছিলেন, সঙ্গে পরিবার। আর পাঁচটা শিশুর মতো সেও বাবা-মার হাত ধরে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল।

সেই ছোট্ট মেয়েটি এখন মধ্যবয়সিনি। নাম, পলবিন্দর কউর শেরগিল। তাঁর কথা লিখতে হচ্ছে কারণ তিনি সম্প্রতি কানাডার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন। এই প্রথম অমৃতধারী শিখ সম্প্রদায়ের কেউ সে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করলেন।

সম্প্রতি কানাডার আইনমন্ত্রী এবং অ্যাটর্নি জেনারেল জোডি উইলসন পলবিন্দর কউর শেরগিলের নাম ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, এই নিয়োগ হয়েছে কানাডার নতুন বিচারবিভাগীয় নিয়োগপদ্ধতি অনুসরণ করে। নতুন পদ্ধতিতে জোর দেওয়া হয়েছে স্বচ্ছতা মেধা এবং দক্ষতার ওপর। জাস্টিস ইএ আরনল্ড বেইলি গত ৩১ মে অবসর নিয়েছেন। পলবিন্দর কউর শেরগিল তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হলেন।

স্বাভাবিক ভাবেই খবরটি পেয়ে কানাডায় শিখ সম্প্রদায় উল্লসিত। বিশ্ব শিখ সঙ্ঘের সভাপতি সর্দার মখবীর সিংহ বলেন, 'বিচারপতি হিসেবে পলবিন্দর শেরগিলের নিয়োগ কানাডায় বসবাসকারী শিখ সম্প্রদায়ের মুকুটে আর একটি পালক। কানাডার সর্বোচ্চ আদালতে একজন অমৃতধারী শিখ বিচারপতি হয়েছেন, এটা এ দেশের প্রতিটি শিখের কাছে গর্বের ব্যাপার।'

পলবিন্দর কউর শেরগিলের জন্ম পঞ্জাবের জলন্ধর জেলায়। মাত্র চার বছর বয়েসে তিনি বাবা-মার সঙ্গে কানাডায় পাড়ি দেন। তারপর কানাডার উইলিয়ামস লেক বিসি-তে একটু একটু করে বেড়ে ওঠা। বিখ্যাত স্যাসক্যাচেওয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রিলাভ।

কানাডার আইনমন্ত্রক সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিচারপতি হওয়ার আগে পলবিন্দর কউর শেরগিল আইনজীবী হিসেবে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ২০১২ সালে তিনি কুইনস কাউন্সিল নিযুক্ত হন এবং কয়েক বছরের মধ্যে কমিউনিটি সারভিসে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কুইনস গোল্ডেন জুবিলি পদক লাভ করেন।

পলবিন্দার কউর শেরগিলের ব্রিটিশ কলম্বিয়া বারে যোগদান আরও কিছুদিন আগে। ১৯৯১ সালে। আইনি দুনিয়ার ভেতরে এবং বাইরে— সর্বত্র বহুবার তাঁকে নেতৃত্ব প্রদান করতে দেখা গেছে। বহু সংস্থার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। যাদের মধ্যে রয়েছে কানাডার ক্যাবিনেট, ট্রায়াল লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, কানাডিয়ান বার অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি। ব্যক্তিগত জীবনে পলবিন্দার স্বামী, এক কন্যা এবং দুই যমজ পুত্রের সঙ্গে থাকেন। সুখী ভারতীয় পরিবার বলতে যা বোঝায় শেরগিল পরিবার তাই। অটুট মূল্যবোধে বাঁধা। সাফল্য কোনওভাবেই যাকে বিকৃত পারে না।

ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের 'হফম্যান'

তাঁকে অনায়াসেই এই আখ্যা দেওয়া যায়। হ্যারি হফম্যান যেমন ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার টেনিস সমাজের কাছে তেমনি পুলেল্লা গোপীচাঁদ এদেশের ব্যাডমিন্টনের সাপেক্ষে। হফম্যানের হাত ধরে উঠে এসেছে একের পর এক 'গ্রেট মাস্টার'। আর বিশ্ব টেনিসে টানা তিন দশক রাজ করেছে অস্ট্রেলিয়া। সম্প্রতি ভারতও বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে কুলীন গোত্রে অবস্থান করছে। এর পিছনে সিংহভাগ অবদান হায়দরাবাদের ওই অ্যাকাদেমি— যার মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড সব কিছু গোপীচাঁদ। কিদাম্বি শ্রীকান্ত টানা তিনটি সুপার সিরিজ ফাইনাল খেলে দুটিতে চ্যাম্পিয়ন। এর আগে আরো দুবার সুপার সিরিজ খেতাব জিতেছেন। সাই প্রণীত এইচ প্রণয়, পারুভেল্লি কাশ্যপ প্রত্যেকেই তার অ্যাকাদেমির ফসল যারা কোনো না কোনো বড় মাপের আন্তর্জাতিক খেতাব জিতেছে। আর মহিলাদের মধ্যে সাইনা নেওয়াল আর পি. ভি. সিন্ধু বিশ্বের সর্বোচ্চ মঞ্চে পদকজয়ী। এহেন দ্রোণাচার্য সম্প্রতি খোলামেলা এক সাক্ষাৎকারে অকপট জানিয়েছেন তাঁর মনের কথা। কথা বলেছেন জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুলেল্লা গোপীচাঁদ

□ কী হিসেবে আপনি ব্যতিক্রমী শিক্ষক?

● ব্যতিক্রমী কিনা বলতে পারব না। তবে আমি সবসময়ই আমার কোচিংয়ে নতুন ভাবনাচিন্তা আমদানি করি যা আধুনিক বিশ্বের সাপেক্ষে প্রয়োগ রীতিতে অন্যমাত্রা প্রদান করে। আর ইতিবাচক চিন্তা-চেতনার তরঙ্গে জারিত করি ছাত্রছাত্রীদের।

□ কট্টর সমালোচকরা আপনাকে 'হফম্যান অব ইন্ডিয়ান ব্যাডমিন্টন' বলছেন, কী বলবেন?

● আমি এখনই ওই তুলনায় যেতে চাই না। হ্যারি হফম্যান জীবদ্দশাতেই 'আইকন' হয়ে গেছেন। তাঁর নামে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট চলছে। বিশ্ব টেনিসে রথী-মহারথী সব বেরিয়েছে তাঁর হাত থেকে। তবে আমি শ্রদ্ধেয় হফম্যানের জীবন দর্শন ও কোচিং পদ্ধতিকে আগাগোড়া অনুসরণ করে চলি। তাঁর মতো আমিও তারকা থেকে উঠতি ছেলে মেয়েদের পারিবারিক জীবন, চরিত্র, প্রকৃতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা-সংস্কৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করে কোচিং পদ্ধতি ঠিক করি। তাই হয়তো আমার ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে ভারতের মুখ ও মুখচ্ছবি হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি বলতে হয় ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের 'গড ফাদার' প্রকাশ পাড়ুকোন যথেষ্ট ভাল কাজ করছেন। তার অ্যাকাদেমি থেকেও অনেক ভাল ভাল খেলোয়াড় উঠে আসছে। হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুই আজকে ভারতের ব্যাডমিন্টনের আত্মা।

□ এক ঝাঁক তারকার সাফল্যে সরকারের কি টনক নড়বে?

● মনে হয় নড়বে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি ও প্রকাশ স্যার যতটা পারি করে যাচ্ছি। বড় বড় শিল্প সংস্থা ও রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থা আমাদের পিছনে আছে বলেই পরের পর সাফল্য আসছে। তবে এবার জাতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থা এবং সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রক এগিয়ে আসুক সারা দেশ থেকে প্রতিভা তুলে আনার জন্য। সরকার এবং অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষমতা ও কাজের পরিসর অনেক বড়। তাদের অসাধ্য কিছুই নেই। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে ভারত বিশ্ব মঞ্চে 'সুপার পাওয়ার' হয়ে উঠবে। যেমন এককালে ছিল ইন্দোনেশিয়া, ডেনমার্ক, এখন চীন, কোরিয়া। কিদাম্বির অসাধারণ সাফল্যের পর প্রধানমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রী ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তাই মনে হয় এবার ব্যাডমিন্টনে দেশ জুড়ে বিপ্লব হয়ে যাবে।

□ নিজে অল ইংল্যান্ড জিতেছেন, ছাত্র-ছাত্রীরাও সুপার সিরিজ বা বিশ্ব খেতাব জিতছে, কেমন লাগছে?

● অল ইংল্যান্ড জিতে যেমন আনন্দ পেয়েছি তেমনি তৃপ্তি পাই ছাত্র-ছাত্রীরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে বড় সাফল্য পেলে। চোট আঘাতে নিজের কেরিয়ার অকালে দাঁড়ি টানতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, বড়মানের গ্রান্ড্রি খেতাব জেতা হয়নি। নিজের অতৃপ্ত বাসনা পূরণে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাই প্রথমেই সেই স্বপ্নের জাল বুনে দিই যে উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দর্শন যতদিন না সর্বোচ্চ স্তরে উঠাতে পারছে ততদিন থেমে থাকা চলবে না। আর সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে গেলে যে অধ্যাবসায়, পরিশ্রম সংকল্প দরকার তা আমার এই অ্যাকাদেমিতে এলে সব পূরণ হয়ে যাবে। প্রতিভার ঘাটতি এইসব বৈশিষ্ট্য দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায়। আমি নিজে খেলোয়াড় জীবনে এই সত্য মেনে চলেছি, চাই আমার ছাত্রছাত্রীরাও তা যথার্থ অনুসরণ করবে। এভাবে চলেই সাইনা, সিন্ধু, কিদাম্বি, প্রণীত, প্রণয়রা সাফল্য পাচ্ছে।

□ আগাম পরিকল্পনা ও লক্ষ্য কী?

● এ বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। যে মিটে সাইনা রুপো, সিন্ধু ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। কোনও পুরুষের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি পদক জেতার ব্যাপারে। কিদাম্বির কাছে এবার ওই মহার্ঘ্য পদকটা চাই। তার জন্য বিশেষ ট্রেনিং ও কোচিং শুরু করেছি। মালয়েশিয়ার হান্দোয়া এসে যাওয়ায় কোচিং ব্যাপারটায় অনেক পরিমার্জনা ও উদ্ভাবনী বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছে। যা আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। তাই মনে হয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ও পরের বছর এশিয়াড ও কমনওয়েলথ গেমসে ভারত দলগত ভাবে এক বড় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তাহলেই আমার ও প্রকাশের স্বপ্ন ও সাধনা বাস্তবে রূপ পাবে।

স্বাধীনতা সৈনিক

নবাঙ্কুর

বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল

১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল। বৃহস্পতিবার। রাত আটটা। মজফ্ফরপুর শহর।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে নির্জন পথের ধারে একটি গাছের আড়ালে অপেক্ষা

করছে দুই তরুণ। এইবার ইউরোপিয়ান ক্লাব থেকে ফিরবেন অত্যাচারী কিংসফোর্ড সাহেব। তাকে মারার জন্য উল্লাসকর দত্ত ও হেমচন্দ্র কানুনগো দুজনে মিলে এক বিশেষ বোমা তৈরি করেছে। ক্ষুদিরামের হাতে সেই বোমা। এছাড়াও তার পকেটে আছে দুটি রিভলবার। একটি গুলি ভরা, একটি খালি। আর প্রফুল্লর কাছে আছে গুলি ভরা একটি পিস্তল।

দুজনে দুরুদুরু বুকে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় বসে আছে। এর আগেও কিংসফোর্ডকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাই কলকাতা থেকে দুজনে এসেছে মজফ্ফরপুর। এবার কিংসফোর্ডের মৃত্যু নিশ্চিত।

একটু বাদে দেখা গেল ইউরোপিয়ান ক্লাব থেকে একটি গাড়ি বেরিয়ে আসছে। খুব জোরে ছুটছে গাড়িটি। এটা নিশ্চয় কিংসফোর্ডের গাড়ি। আজ আর ওর রক্ষে নেই। আনন্দে নেচে উঠলো দুই তরুণের মন।

গাড়িটি এগিয়ে আসতেই ক্ষুদিরাম দৌড়ে গিয়ে বোমাটি ছুঁড়ে মারলো গাড়ির ভিতর। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো চারিদিক। ভেঙে গুড়িয়ে গেল গাড়িটি।

কাজ শেষ। অবশেষে খতম হলো কিংসফোর্ড। আনন্দিত হলো দু'জন। এবার আত্মরক্ষা করতে হবে। কিন্তু জুতো পায়ে তো ছোটা সম্ভব নয়, তাই জুতো ফেলে রেখেই রাতের অন্ধকারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলো ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল। অন্ধকার থাকতেই তাদের দূরে কোথাও আত্মগোপন হবে। শহর ছাড়িয়ে রেললাইন ধরে দৌড়তে লাগলো দুজনে। তারপর ছুটতে ছুটতে এক সময় তারা আলাদা হয়ে গেল।

এদিকে তখন গোটা মজফ্ফরপুর শহর তোলপাড়। বোমার শব্দে কেঁপে উঠেছে গোটা শহর। চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে পুলিশ মহলে। শহরজুড়ে তাদের তৎপরতা। বাড়ি বাড়ি চলছে তল্লাসি। ত্রাস তৈরি হয়েছে ইংরেজদের মনে। ওরা ভয়ে কেউ বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না। রাস্তায় চৌকিদারদের চিৎকার। তার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে— কোনো বিপ্লবী একটি গাড়িতে বোমা ছুঁড়ে মেরেছে। সেই গাড়িতে ছিল একজন ইংরেজ আইনজীবীর পরিবার। তাদের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ভাগ্য ! এবারও বেঁচে গেল কিংসফোর্ড।

ক্ষুদিরামরা ভুল করেছে। তারা যে গাড়িটিকে কিংসফোর্ডের গাড়ি ভেবে বোমা মেরেছিল সেটি ছিল আসলে জন কেনেডি নামে এক ইংরেজের গাড়ি। কেনেডির পরিবার ইউরোপিয়ান ক্লাব থেকে ফিরছিলেন। তাদের গাড়িটি দেখতে হুবহু কিংসফোর্ডের গাড়ির মতো।

কিন্তু কিংসফোর্ড সেদিন বেঁচে গেলেও ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লর দুঃসাহসী কাজ কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল ইংরেজ সরকারের বুকে। আর ভারতবাসীর মনে অমর হয়ে রয়েছে বীর বিপ্লবী স্বাধীনতা সৈনিক ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল।

ত্রিদিব সোম

ভারতের পথে পথে

সেলুলার জেল

ইংরেজ শাসনকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্দি করে রাখা হতো আন্দামানের সেলুলার জেলে। ১৯০৬ সালে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ইংরেজরা এটি নির্মাণ করে। বীর সাভারকরের মতো অজস্র দেশপ্রেমিককে এখানে কারাবাস ভোগ করতে হয়েছে। বটুকেশ্বর দত্ত, উল্লাসকর দত্তও এখানে ছিলেন। পোড়ামাটির ইটে নির্মিত এই জেল দালান বর্তমানে একটি স্মৃতি-স্মারক। সেলুলার জেল ভারতীয়দের কাছে এক বেদানার্ত তীর্থভূমি। যার প্রতিটি ইটে লেগে আছে ভারতের বীর সন্তানদের প্রতি অত্যাচারের স্মৃতি।

এসো সংস্কৃত শিখি

वित्तकोष: कियद्दूरे अस्ति।

ব্যাঙ্ক কত দূরে আছে?

किमर्थम् एवं त्वरा?

কীসের এত তাড়া?

सर्वस्य अपि सीमा भवेत्।

সবকিছুরই সীমা থাকা উচিত।

कियद् दातुं शक्यम्।

কত দিতে পার?

कस्मिन् समये प्रतीक्षा करणीया?

কখন অপেক্ষা করতে হবে?

ভালো কথা

সন্তুষ্টি

বারান্দাতে শুকোতে দেওয়া চাদরটা নীচের গলিতে পড়ে গেছে। নীচে গিয়ে তুলে আনতে বললেন মা। আমার যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু মায়ের আদেশ কী করে অমান্য করি? তাই যেতেই হলো। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দেখি গলির গেটে তালা। একবার ভাবলাম গেটটা টপকে যাই। কিন্তু মনে অতো সাহস নেই। আমাদের বাড়ির সামনের ফুটপাতে অনেক গরিব মানুষ থাকে। তাদেরই একটি বাচ্চা ছেলে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি ওকে চাদরটা তুলে দিতে বললাম। ছেলেটি দৌড়ে গিয়ে গেট টপকে চাদরটা নিয়ে এলো। আমি ওকে ধন্যবাদ দিতেই ছেলেটা একটা অনুরোধ করলো— আমাকে একটু বরফ দেবে? আমি ওকে উপরে ডেকে এনে ফ্রিজ থেকে বরফ দিলাম। তাই পেয়ে ছেলেটির কী আনন্দ! অনেক কিছু পাওয়ার পরও আমাদের মন ভরে না, অথচ ছেলেটি সামান্য একটু বরফ পেয়েই কী খুশি। একটু বরফ দিতে পেরে আমারও খুব ভালো লাগলো।

মৌনব দাস, ষষ্ঠ শ্রেণী, তারক প্রামাণিক রোড, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

মা

বিবেক রায়, একাদশ শ্রেণী, মালদা

মাগো তুমি অনেক বড়
তোমার অনেক বড় মন,
এই ধরাতে তোমার মতন
হয় না কেউ আপন।
সবার উপর তুমিই মাগো
উচ্চ তোমার আসন,
আলো দেখায় জীবনে মোদের
তোমার স্নেহের শাসন।

তোমার ছায়ায় শান্তি মাগো
সারাজীবন ভরে
আগলে রেখো সদা মোরে
তোমার স্নেহডোরে।
ত্রিভুবনে আর কেউ নাই
তোমার মতো মহান,
জনম জনমে শোধ হবে না মা
তোমার দেওয়া দান।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

মঙ্গলনিধি

মালদহ জেলার মালদহ নগর কার্যবাহ নারায়ণ মণ্ডলের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি রূপো কম্পিউটারের প্রিন্টার প্রদান করেন তাঁর বাবা ও মা। মঙ্গলনিধি গ্রহণ করেন উত্তরবঙ্গ সহ-প্রান্ত কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত। উপস্থিত ছিলেন বিভাগ প্রচারক ধনেশ্বর মণ্ডল-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

* * *

মালদহ জেলার সঙ্ঘের সেবা টোলির সদস্য মাদিয়া শাখার স্বয়ংসেবক কিরীটী কিশোর নাগর শর্মা গত ১৯ জুন তাঁর কন্যা গার্গীর বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ অধিকারীর হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ রাজদীপ মিশ্রের পুত্র আত্মদীপের শুভ অন্নপ্রাশনে তাঁর মা মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৩০ এপ্রিল বসিরহাট জেলার গন্ধর্বপুর শাখার স্বয়ংসেবক রিপুজয় সরকার তার ছোট ভাই রামলাল সরকারের বধূবরণ অনুষ্ঠানে তাঁর বাবা গোবিন্দ সরকার মঙ্গলনিধি প্রদান করেন বসিরহাট জেলা সঙ্ঘচালক সুকুমার বৈদ্যের হাতে।

* * *

গত ২৪ মে, বারুইপুর জেলার রাজপুরের কালীতলা শাখার স্বয়ংসেবক ও সমাজ সেবা ভারতীর কার্যকারী সমিতির সদস্য শঙ্করলাল সরকারের পুত্র সম্পদের বধূবরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর হাত দিয়ে রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর সহসচিব গুরুশরণজীর হাতে মঙ্গলনিধি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা ভারতী দক্ষিণবঙ্গের কার্যকারী সভাপতি শিবদাস বিশ্বাস, সেবা ভারতী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সম্পাদক অজিত বসু, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারুইপুর জেলা সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালী, কলকাতা মহানগরের অতি দক্ষিণ ভাগের সঙ্ঘচালক শীতেশ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

শোকসংবাদ

গত ১৫ জুন কলকাতার টালিগঞ্জ শাখার নিষ্ঠাবান, আদর্শ স্বয়ংসেবক অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ রোগভোগের পর ৬৭ বৎসর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়িতে পরলোকগমন করেন। ষাটের দশকে বাল্যকালেই তিনি টালিগঞ্জ শাখার স্বয়ংসেবক হন। ছোট বয়সেই তাঁর মা-বাবা পরলোকগমন করেন। ফলে দাদা দিদিদের কাছে থেকে বড় হয়েছেন। দাদা দিদিরা কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় তাঁকে শাখার আসার জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। কর্মজীবনে কলকাতা পুলিশে চাকুরি করতেন। চাকুরিকালীন তিনি সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রতিদিন অর্থ সংগ্রহ করে তিনি উল্লেখযোগ্য গুরুদক্ষিণা করতেন। নগরের শারীরিক প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। মহানগরের বহু শীত শিবিরে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। পশ্চিম পুটিয়ারী এলাকায় পরোপকারী অমায়িক সজ্জন হিসেবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একমাত্র কন্যা, জামাতা, দুই ভাইঝি, আত্মীয় স্বজন এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ মানুষ রেখে গেছেন। তাঁর আত্মার সদগতি কামনা করি।

* * *

মালদা নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক সঞ্জিত কুমার ঘোষ দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ১৫ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি স্ত্রী ও ২ পুত্র রেখে গেছেন। আবাল্য স্বয়ংসেবক সঞ্জিত ঘোষ ছাত্রজীবনে বিদ্যার্থী পরিষদ, পরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ প্রভৃতি সংগঠনের নানাবিধ দায়িত্ব পালন করেছেন। শেষে তিনি একল বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

* * *

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গোপালপুর শাখার স্বয়ংসেবক তথা উত্তরবঙ্গের আরোগ্য ভারতীর কার্যকর্তা অমিয় মাহাতর মাতৃদেবী রুদবালা মাহাত গত ২৬ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি- নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ শঙ্কর প্রসাদ ঘোষ গত ২ জুন রাত্রিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন হুগলী জেলার আরামবাগস্থিত পুরাতন বাজার নিবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। স্ত্রী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি সঙ্ঘের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বয়ংসেবক। তাঁর অকাল মৃত্যুতে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের প্রান্ত সমিতির পক্ষে গত ৩ জুন স্মরণ সভা পালন করা হয়।

* * *

বাঁকুড়া জেলার মোলবনা শাখার স্বয়ংসেবক বরেন্দ্রনাথ রুইদাসের মা গেনুবালা রুইদাস গত ৫ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আসানসোল জেলার জাগরণ প্রমুখ দেবতোষ মুখোপাধ্যায়ের মাতৃদেবী রুমা মুখোপাধ্যায় দিল্লিতে মেয়ের বাড়িতে গত ২২ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

গত ২৪ জুন মেদিনীপুর নগরের স্বয়ংসেবক সন্দীপ রানার পিতা স্তুতিরঞ্জন রানা খড়্গপুর স্টেশনে ট্রেন দুর্ঘটনায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর পুত্র সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষ শিক্ষিত এবং কন্যা রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রথম বর্ষ শিক্ষিতা।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
10 July - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।